ঢেউ আসে ঢেউ যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

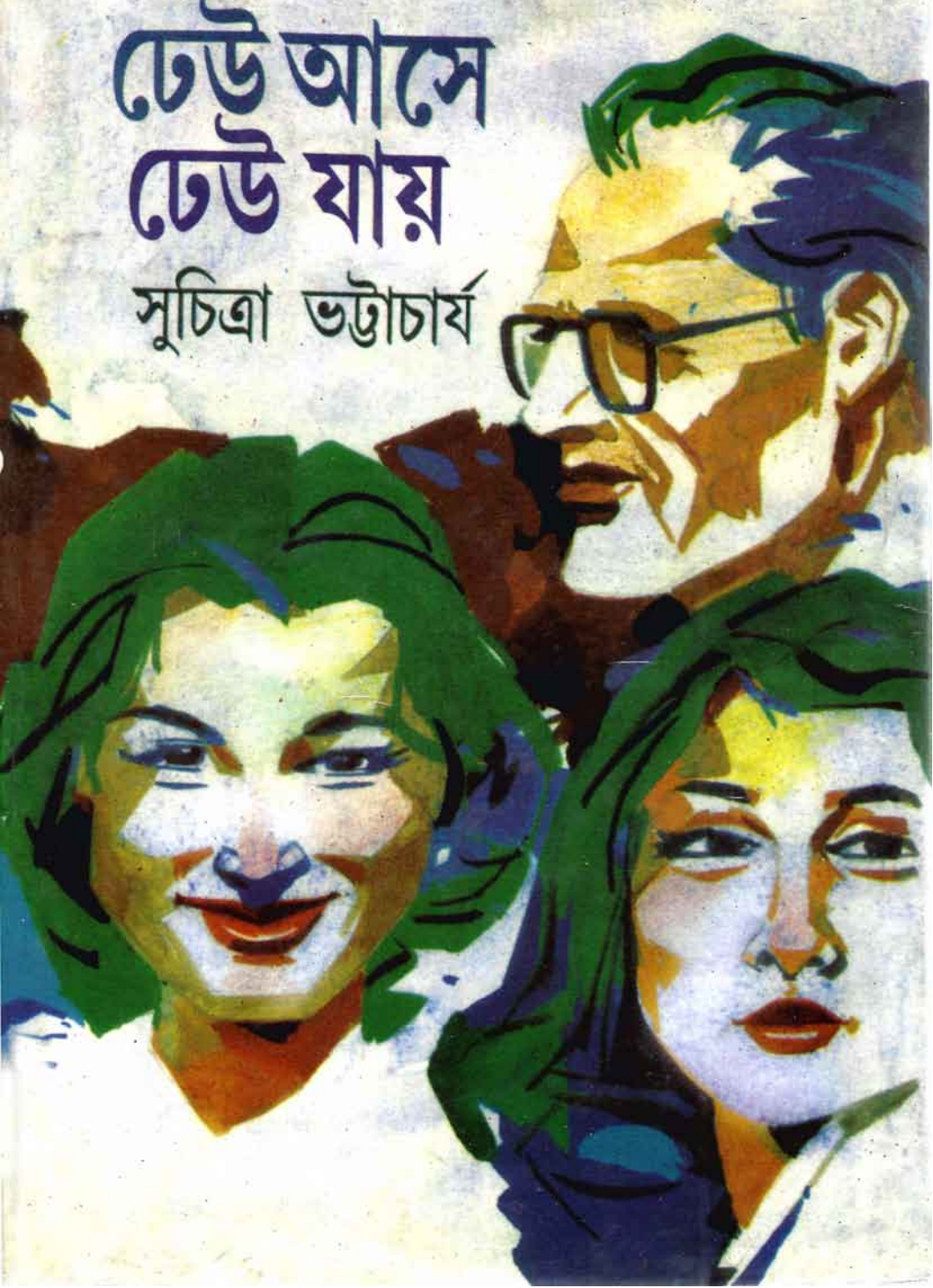

ঢেউ আসে ঢেউ যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

ঢেউ আসে, ঢেউ যায়

এক দিন দল বেঁধে

কামরা থেকে একটা একটা করে মালপত্র নামাচ্ছিল শুভ্র আর পল্লব। ব্যস্তসমস্ত মুখে। সতর্ক চোখে। একটু অসাবধান হলেই কে কোথায় কোন্ মাল নিয়ে চম্পট দেয় তার ঠিক কী! পুরী ধর্মস্থান বটে, তবে কে না জানে পুণ্যক্ষেত্রেই চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বেশি।

জগন্নাথ এক্সপ্রেস আজ ঘণ্টা দেড়েকের ওপর লেট। ভুবনেশ্বর অবধি ঠিকঠাকই চলছিল, খুর্দারোডে এসে খামোকা দাঁড়িয়ে রইল নিঝুম। ছাড়েই না, ছাড়েই না। যাও বা ছাড়ল বাকি পথ এল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একটু থামে, একটু চলে, থামে... কোথায় সাড়ে পাঁচটায় ইন্ করে যাওয়ার কথা, সাতটা বাজিয়ে দিল!

মেয়েরা আগেই নেমে পড়েছে। জয়া মিত্রা বন্দনা তিন জনেরই চুল উশকো খুশকো, শাড়ির ভাঁজ এলোমেলো, বাসি মুখে আলগা ক্লান্তি। জয়ার গা ঘেঁষে টুটুল, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করছে চারদিক। সাড়ে তিন বছরের মেয়েটার চোখে অচেনা স্বপ্নরাজ্য দেখার বিস্ময়।

অবাক চোখেই টুটুল প্রশ্ন করল,—বাবা, ও বাবা, এটা কি পুরী?

অনুতোষ মাথার ওপর দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল,—ইয়েস ম্যাডাম, আমরা পৌঁছে গেছি।

—যাহ্, এখানে সমুদ্র কোথায়?

—দূর বোকা, সমুদ্র কি স্টেশনে থাকে?

—তাহলে কোথায় আছে?

—আছে, নিজের জায়গাতেই আছে। অনুতোষ মেয়ের চুল ঘেঁটে দিল। এক্ষুনি দেখতে পাবি, আমরা স্টেশন থেকে বেরোই।

বাপ মেয়ের বকর বকর চলছে। মাল নামানোর পালা শেষ, এবার নেমেছে মধুময়। ঘাড়ে ইয়া এক কিটস্ ব্যাগ। প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই সে ব্যাগ স্যুটকেসের পাহাড়ের দিকে তাকাল,—মোট কটা হল রে?

শুভ্র আঙুল চালিয়ে আরেক বার গুনে নিল,—নাইনটিন।

—তোরা মাত্র সওয়া ছ' জন মানুষ, থাকবি মাত্র ক'টা দিন, তাতেই এত? মধুময় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল,—মাইরি, মেয়েছেলে সঙ্গে থাকা মানেই এক গাদা লাগেজ।

সঙ্গে সঙ্গে মধুময়ের কাঁধে পল্লবের চটাস থাপ্পড়,—এই এঁড়ে, মেয়েছেলে কী রে? এখনও ভাষাজ্ঞান হল না?

—যাহ্ বাবা, ভুল কী বললাম?

—শালা, লেবার তো লেবারই। মহিলা বা লেডিজ বলতে পারিস না?

—ও এই কথা! ঘাড়ে হাত বোলাল মধুময়,—সরি বস্।

মিত্রার জিম্মায় গোটা চারেক ওয়াটার বটল। এখনও তলানি জল পড়ে আছে, রেল লাইনে ঢেলে ঢেলে শূন্য করল বোতলগুলো, গুছিয়ে নিচ্ছে কাঁধে। মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল,— কথার কী ছিরি!

শুভ্র ফুট কাটল,—ভাষাজ্ঞান যেমনই হোক, খুব ভুল কথা কিন্তু মধু বলে নি। মেয়েরা সঙ্গে না থাকলে কত ঝাড়া হাত পা থাকা যায়।

—তাই বুঝি? আমরা সঙ্গে থাকলে বুঝি বোঝা বাড়ে? জয়ার চোখে ছদ্ম কোপ।

—অফকোর্স। শুভ্র পল্লবকে চোখ টিপল,—আসল লাগেজ তো তোমরাই। লিভিং লাগেজ।

—কী রে মিত্রা, চুপচাপ শুনে যাচ্ছিস, কিছু বলছিস না যে?

—বলতে দে, বলতে দে। মিত্রার ঠোঁটে আবার ভাঙচুর,—কে যে কার বোঝা তা যদি অত সহজেই বোঝা যেত!

—আরেব্বাস পুলু, তোর বউ-এর তো দেখছি দিব্যি মুখ ফুটে গেছে। ক'মাস হল তোদের বিয়ের?

—সাড়ে পাঁচ মাস। পল্লব হাসি হাসি মুখে সিগারেট ধরাল,—টু বি মোর এগ্জ্যাক্ট, পাঁচ মাস দশ দিন।

মালপত্র ঘিরে গুলতানি চলছে। কামরাটা একেবারে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে, স্টেশন থেকে বেরোতে বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে। যাত্রীরা এগোচ্ছে যে যার মতো, এদিকটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এল। পড়ে আছে শুধু পাণ্ডারা, কানের কাছে গুনগুন করছে। মন্ত্র পড়ার মতো। পল্লবরা কেউই তাদের কথা শুনছে না, তবুও তাদের নড়ার লক্ষণ নেই।

অনুতোষ কুলিদের সঙ্গে দরাদরি শুরু করল। তার কথাবার্তা হাঁটাচলা সবেতেই বেশ নেতা নেতা ভাব, ধমকে-ধামকে নিজের দরেই রাজী করিয়ে ফেলল কুলিদের। ব্যাগ স্যুটকেস তাদের কাঁধে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল,—চল্ চল্, হ্যাহ্যা হিহি পরে করিস্।

সকালটা আজ ভারি মনোরম। সবে ফাল্গুন পড়েছে, বাতাসে এখন বসন্তের ঘ্রাণ। রোদও তেমন ওঠে নি এখনও। কচি সূর্য ঘুমভাঙা শিশুর মতো লেপটে আছে পূব আকাশে। আড়মোড়া ভাঙছে, হাই তুলছে, তাপ ছড়ানোয় মন নেই।

অনুতোষ কুলিদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। পিছু পিছু বন্দনা। খানিক গিয়ে দাঁড়াল অনুতোষ, বন্দনাকে পাশে আসতে দিল, পাশাপাশি দ্রুত পায়ে হাঁটছে দুজনে।

পল্লব শুভ্রকে দেখাল দৃশ্যটা। হাল্কা ভাবে বলল,—কী রে, তোর বউ যে দেখি এখনই অন্তর সঙ্গে সেঁটে গেল!

শুভ্র হাত ওল্টালো,—তাই তো দেখছি। ট্রেন থেকে নেমেই লক্ষ্মী মেয়ের মতো শর্ত পালন শুরু করল। এদিকে জয়া আমার সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করে চলেছে।

বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা মধুময়ের ধাতে নেই। ফস্ করে সে স্বভাবসিদ্ধ নির্বোধ মন্তব্য করে বসল,—তুই যদি জয়াকে নিস, তাহলে তো শুধু মিত্রা পড়ে থাকে। মিত্রার তাহলে কী হবে?

—মানে?

—মানে আর কি! ও তো আর তোদের শর্ত মতো পল্লবের নয়। মিত্রা কি তবে আমার ভাগে পড়ল?

—খুব যে রে শালা। পল্লব আবার এক রদ্দা কষাল মধুময়ের কাঁধে,—খুব রস হয়েছে, অ্যাঁ?

শুভ্র ঠং করে একটা গাঁট্টা মারল,—তোর ভাগে কাকে রাখা হয়েছে জানিস না?

বন্ধুদের এ ধরনের চড় চাপড়ে মধুময় মোটামুটি অভ্যস্ত। সেই ছোটবেলা থেকেই সে শুভ্র পল্লবদের মজা আর হাতের সুখ করার খোরাক। এতে কি মধুময়ের মনে কোনও গ্লানি আছে? সে তো জানেই তার বুদ্ধি কম। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গ করতে গেলে এই ব্যবহার তো তার প্রাপ্যই।

নির্মল হেসে মধুময় প্রশ্ন করল,—কে রে? কে রে?

—টুটুল, আবার কে! যাহ্, ওকে কাঁধে তুলে নে।

টুটুলকে নিয়ে জয়া মিত্রা সামান্য পিছনে। শুভ্র পল্লবদের কথা বুঝি কিছু কানে গেছে তাদের। জয়া লঘুস্বরে কথা ছুঁড়ল,—অ্যাই, কী ব্যাপার বলুন তো?

মধুময়ই ঘাড় ঘোরাল,—কীসের কী ব্যাপার?

—ওই যে বন্দনা শর্ত মেনে চলছে .... কীসের শর্ত?

—ওমা, তোমরা জানো না? পল্লব শুভ্র বারণ করার আগেই মধুময় বলে উঠল,—ট্রেনে ওঠার আগেই তো ঠিক হয়ে গেছে, পুরী পৌঁছে বর বউ সব বদল হয়ে যাবে।

—মানে? জয়ার চোখ বড় বড় হল।

—মানে খুব সহজ ম্যাডাম। মধুময়কে থামিয়ে শুভ্র কাঁধ ঝাঁকাল,—আমরা ডিসাইড করেছি একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনব। রোজই এক বউ, পানসে ব্যাপার। ....মধুর অবশ্য শুধুই সমুদ্র দেখার কথা ছিল, এখন দেখছি ওরও প্রাণে পুলক জেগেছে।

টুটুল ছুট্টে এসে মধুময়ের হাত ধরল,—পুলক মানে কী গো মধুকাকা?

—তুই থাম্। মেয়েকে আলগা ধমক দিয়ে খিলখিল হেসে উঠল জয়া,—প্ল্যানটা কার শুনি? আপনার?

—যদি বলি তোমার বরের?

—হতেই পারে না। আমার বর মোটেই আপনাদের মতো অসভ্য নয়।

—বটেই তো, বটেই তো। অন্তু একেবারে ভিজে বেড়ালটি।

—আর তুমি হলে গিয়ে চিত করা ভাজা মাছ।

পল্লবের ফোড়নে পায়রা ওড়ানো হাসি উঠল। জয়া হাসছে, মিত্রা হাসছে, এমনকি টুটুলও হাসছে কিছু না বুঝে। হাসতে হাসতেই সকলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

পর পর চারটে রিক্সায় তোলা হয়েছে মালপত্র। অনুতোষ আর বন্দনা নতুন করে মাল গুনে নিচ্ছে।

শুভ্র কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল,—এবার তাহলে কে কোন্ রিক্সায় উঠবে ঠিক করো।

মিত্রা তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আমি আর জয়া একটায় উঠছি।

—উঁহু। শুরুতেই প্ল্যান ভেস্তে দিও না। পল্লব ফিচেল হাসল,—বন্দনা তো আগেই অন্তুকে বেছে নিয়েছে, এবার তোমাদের টার্ন।

বন্দনা থতমত মুখে সবার দিকে তাকাল,—ও আবার কী কথা? আমি আবার কখন কী বাছলাম?

শুভ্র দাঁতে ঠোঁট চেপে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল,—অন্তুকে তোমার পছন্দ নয় বলছ? বেশ তবে পুলু... নয়তো মধু ...

সকলেই মুখ টিপে টিপে হাসছে। এমনকি অনুতোষও। বন্দনার কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

হঠাৎই সে খেপে গেল,—আমি একাই একটা রিক্সায় যাব।

—আহা, চটছ কেন? অনুতোষের মুখে স্বভাবসুলভ নরম হাসি,—বুঝছ না, ওরা তোমার পেছনে লাগছে।

বন্দনা দুম করে সামনের রিক্সাটায় উঠে বসল,—অমন ভালগার রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

পলকে গোটা পরিবেশটাই বদলে গেছে। সবাই গম্ভীর, সবাই অন্যমনস্ক। যেন কেউই বন্দনার কথা শুনতে পায় নি এমন একটা ভান করছে সক্কলে। শুভ্র যে শুভ্র, যার মুখে সর্বদা কথার খই ফোটে, চটুল রসিকতা ছাড়া যে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, তার মুখের হাসিটিও উধাও।

মধুময় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল এদিক ওদিক। আমতা আমতা করে বলল, —তাহলে আমি কি টুটুলকে নিয়ে একটা রিক্সায় যাব?

মিত্রা রুক্ষ হল,—যা ইচ্ছে করুন। জয়া, তুই আমার সঙ্গে আয়।

কিঞ্চিৎ টালবাহানার পর চারটে রিক্সাই ছাড়ল। টুটুলকে কোলে নিয়ে মধুময়, পাশে অনুতোষ, শুভ্র পল্লব চতুর্থ রিক্সায়। স্টেশন চত্বর পেরিয়ে রিক্সার মিছিল ঢুকে পড়ল পুরী শহরে। হু হু ছুটছে, বালি বালি পথ মাড়িয়ে। বাতাসে নোনা গন্ধ, বাড়ছে ক্রমশ।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চুয়িংগাম বার করে মুখে পুরল মিত্রা। জয়াকেও দিল একটা। ভুরু কুঁচকে বলল,—বন্দনাটা হঠাৎ অমন রেগে গেল কেন বল্ তো?

—ও এই রকমই। জয়া যেন সামান্য উদাস।

—বেশি বেশি। সবাই বুঝতে পারছে একটা ঠাট্টা ইয়ার্কির ব্যাপার চলছে.... আন্‌নেসেসারি সিন্ ক্রিয়েট করার কোনও মানে হয়!

—বোধহয় শুভ্রদার সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল চলছে। আজকাল কেউ কিছু বললেই.... বিশেষ করে শুভ্রদা....। দেখলি না, কাল ট্রেনে কী করল? সামান্য চাদর পাতা নিয়ে কী অশান্তি!

—টুউউ মাচ্। নিজেদের মধ্যে যা থাকে থাকুক, এক সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওরকম করবে কেন?

—অথচ তুই শুভ্রদাকে দ্যাখ্। ওই মানুষটাও তো কত অসুখী, তবু মুখে হাসি কিন্তু লেগেই আছে।

—সত্যি, শুভ্রদার মতো দিল্‌খোলা মানুষের সঙ্গে বন্দনাকে একটুও মানায় না। ....কী নিয়ে ওদের গণ্ডগোল বল্ তো?

—বুঝি না। মনে হয় ছেলেপুলে হয় নি তাই...

—শুধু ওই কারণে?

—শুধু বলছিস কী রে? ছ' বছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে। আমাদেরও আগে।

—সো হোয়াট? এখনও এমন কিছু বয়স হয় নি। আজকাল কত রকম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে.... মিত্রা কচকচ চুয়িংগাম চিবোল,—আমার ধারণা অন্য কোনও কেস আছে।

—কী রকম?

—সে আমি কী করে বলব?

—তাহলে বললি কেন হঠাৎ?

—না... মানে মনে হল....

—উঁহু, নিশ্চয়ই পল্লবদা তোকে কিছু বলেছে!

—না না, কী বলবে? এসব নিয়ে আমাকে ও কিছুই বলতে চায় না। জিজ্ঞেস করলেই চটে যায়। বলে পি এন পি সি ছাড়ো।

কথা বলতে বলতেই কখন যেন এসে পড়েছে সমুদ্র। নীল বঙ্গোপসাগরের সফেন গর্জন বাড়ছে ক্রমশ, বাড়ছে।

স্বর্গদ্বার এসে গেল।

সামনেই হোটেল। ব্লু লেগুন।

আনমনে জয়া

ভাগ্যিস তিন খানা ঘর পাশাপাশি ঠিক করাই ছিল! এখন অবশ্য ভিড়ের সময় নয়। স্কুলকলেজের পরীক্ষা চলছে, অফিস কাছারিতেও তেমন ছুটিছাটা নেই, তবু আগে থেকে বুক না করলে এমন সুন্দর ঘর কি পাওয়া যেত? দোতলায় তিনটে ঘরের সামনেই এক টুকরো করে ব্যালকনি, দাঁড়ালেই মাতাল সমুদ্র একেবারে মুখোমুখি। নীলাভ সবুজ জলে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে সম্রাটের মতো মাথার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্য, হীরের কুচি মেখে ঝিকমিক করছে জল, বালি, আকাশ পৃথিবী। ভেজা বাতাসের ঝাপটানিতেও কী বিবশ মাদকতা! ঘরের আসবাব অল্প ক্ষয়া বটে, বিছানা টিছানা স্যাঁতসেঁতে.... কী এসে যায়? সমুদ্রের কাছে এসে তার নোনা স্বাদ গায়ে মাখব না?

উফ্, কী ভাল যে লাগছে! কত দিন পর আবার পুরী এলাম!

এখানে আসা ঠিকঠাক হওয়ার পর শুভ্রদা বলেছিল,—আবার আলাদা আলাদা ঘর কেন? একটাই মিক্সড্ বেডেড রুম নিলে হয় না?

সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়েছে অনুতোষ,—ঠিকই তো। একসঙ্গে বেড়াতে বেরোচ্ছি, কেউ তো আর হানিমুনে যাচ্ছি না!

শুভ্রদা বিশ্বফাজিল, এরকম প্রস্তাব দেওয়া তাকে মানায়। কিন্তু অনুতোষ কী করে যে বলেছিল কথাটা! ওভাবে কখনও সবাই মিলে শোওয়া বসা করা যায়? মেয়েদের কত রকম অসুবিধে থাকে না?

ভাগ্যিস তখন জোর গলায় আপত্তি জানিয়েছিলাম,—উঁহু, অন্তত দুটো ঘর নাও।

মিত্রাও বলল,—হ্যাঁ, একটা মেয়েদের, একটা ছেলেদের।

বন্দনা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল,—পাগল হয়েছিস? এদের এখনও চিনিস না? আমরা একটা ঘরে থাকলে সারা রাত ওরা তাণ্ডব চালাবে।

শুনেই পল্লবদার হা হা হাসি,—ওটা তোমাদের অজুহাত। আসলে তোমরাই আলাদা ঘরে থাকতে ভয় পাও। ইউ নিড সাম মেল কেয়ার। অ্যাট লিস্ট ডিওরিং নাইট। যখন কোনও অচেনা মাতাল এসে দরজায় দুম দুম ধাক্কা মারবে....

ব্যাস্, ওমনি শুভ্রদার ফোড়ন,—চেনা মাতাল ধাক্কা দিলে অবশ্য তোমাদের ভয় নেই....

যখন এসব কথা হচ্ছিল, তখন অবশ্য মধুদার আসার কোনও ঠিক ছিল না।

একদম শেষ মুহূর্তে মধুদাকে নেওয়া হল। অসুবিধে হল একটু, সামান্য ছিটকে গেল মধুদা। সিঙ্গল রুম পেয়েছে, একতলায়, একটু ভেতর দিকে।

অনুতোষ এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আয়েসি মানুষ বটে একটা, খাওয়া দাওয়ার পর দু মিনিটও গেল না, সোজা ঝাঁপ দিয়েছে বিছানায়। সকালে সমুদ্রে যেতেই চাইছিল না, শেষ পর্যন্ত অবশ্য শুভ্রদার পীড়াপীড়িতে গাত্রোত্থান করল। বেড়াতে এসেও দলছুট হয়ে আলস্য দেখানো কী ধরনের ঢঙ্ কে জানে!

বন্দনা মিত্রারা এখন যে যার নিজের ঘরে। ঘুমোচ্ছে কি? যা হুড়ুদ্দুম সব করেছে আজ সমুদ্রে, নিশ্চয়ই ক্লান্ত এখন। সমুদ্রস্নানের একটা ফল তো হয়েছেই, বন্দনার রাগটা একদম পড়ে গেছে। অনুতোষের হাত ধরে যখন জলে নেমে গেল, বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। মেয়েটা যেন কেমন কেমন! খুব অহংকারী কি? কিসের দেমাক? রূপসী বলে? আমিই বা কী এমন খেদিবুঁচি! বেশি পড়াশুনো করেছে বলে? চাকরি করে বলে? আহা, আজকাল ওরকম এম. এ. পাশ ঘরে ঘরে গড়াগড়ি যায়। চাকরি তো জয়াও করতে পারত, টালিগঞ্জ গার্লর্স স্কুলে ইন্টারভিউও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, নেহাত টুটুল পেটে এসে গেল....।

টুটুলটা এসেই মধুদার সঙ্গে একেবারে সেঁটে গেছে। খুব ভাব দুজনের। এখনও মেয়ে মধুদার ঘরেই। অনুতোষ বলে মধুটার আই. কিউ. কম তো, টুটুলের সঙ্গে ওর ওয়েভলেঙথ্ মেলে। সে যাই হোক, সারাক্ষণ গায়ে লেপটে থাকছে না, ম্যা ম্যা করে ঘ্যানঘ্যান করছে না, আমি বাবা নিশ্চিন্ত। মধুকাকুই এখন ওর হিরো। কাঁধে করে সমুদ্রের অনেক ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল....। লুডোর বোর্ড নিয়ে তো গেল, খেলছে কি এখন? নাকি ঘুমিয়ে পড়ল? বেয়ারাকে ডেকে একটু পরে মধুদার ঘরে মুসম্বিগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে।

ব্যালকনিতে দুটো চেয়ার। বেতের। বেঁটে বেঁটে। একটু বসি এখানে। আহ্, সমুদ্র কী সুন্দর হাওয়া পাঠাচ্ছে! বাষ্পমাখা, নরম নরম। ফাল্গুনের রোদকেও যেন আর তত কড়া লাগে না।

সকালের কথা মনে পড়ছে বার বার। কাঁটা দিচ্ছে শরীরে। ছি ছি, এমন কেন হচ্ছে? অনুতোষ জানতে পারলে কী ভাববে?

ইস্, সমুদ্রের ঢেউগুলো কী ভীষণ দুরন্ত। অবিরাম নাচতে নাচতে আছড়ে পড়ছে তীরের বুকে। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, মাতামাতি চলছে তো চলছেই। যত দূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। সব্জে নীল রঙ ঘন হতে হতে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে গাঢ় নীল। দীঘায় এমন ধারা হয় না, কেমন যেন ঘোলাটে

ভাব থাকে। মাঝসাগরে কোনও কোনও শান্ত ঢেউ-এর মাথায় মুক্তোর মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে ধবধবে ফেনা। জেলেদের নৌকোগুলো কালো বিন্দু। ডুবছে, ভাসছে, আবার ডুবছে। মনে হয় যেন তুলিতে আঁকা ছবি।

হাই উঠছে। অনুতোষের পাশে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিলে হয়। থাক, এখানেই বসে থাকতে ভাল লাগছে বেশি। নয় এখানে বসেই ঢুলি।

আড়চোখে একবার দেখলাম অনুতোষকে। কী নির্লিপ্ত সুখে ঘুমোয় মানুষটা! জেগে যখন থাকে তখনও কি বদলায়? আশ্চর্য, পাঁচ বছরের ওপর বিয়ে হয়েছে, এখনও যেন অনুতোষের মনের তল পাওয়া গেল না। বড্ড বেশি শান্ত, বড় বেশি চুপচাপ। শাশুড়ি বলেন, ছোটবেলা থেকেই নাকি এরকম। নিজের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ। দুটো চারটে কলেজের ছাত্রছাত্রী যা আসে বাড়িতে, তাদের কথাও তো কানে আসে! এই, আস্তে কথা বল্, এ আর সি বিরক্ত হবে! এই এত শব্দ করে হাসছিস কেন, এ আর সি খচে যাবে! অর্থাৎ কলেজেও অনুতোষের একই চেহারা। হোক না আমার সব থেকে কাছের লোক, এমন মানুষের সঙ্গে বাপু প্রাণ খুলে মেশা যায় না, কেমন যেন বাধ বাধ লাগে। অন্তত আমার মতো বকবক ষষ্ঠীর। হাসির কথা শুনলে হেসে লুটোপুটি খাব, হৈ চৈ করব, এর পিছনে লাগব, তার পিছনে লাগব, এই না হলে বেঁচে থাকা? ঘরের মানুষটিও অমনটা না হলে ভাল লাগে? অনুতোষ কেন যে পল্লবদা শুভ্রদাদের মতো হল না?

মানুষটার ভেতরে কি কোনও উচ্ছ্বাস নেই? উঁহু, তা তো বাপু নয়। দুটো চারটে বিরল মুহূর্তে অনুতোষ কী অসম্ভব বদলে যায়, তা কি দেখি নি আমি? বেতলার জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে সেবার কী বৃষ্টি! মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা ফাঁকা। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। ও হরি, বাবু বাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে একা একা ভিজছেন! আমি ডাকতেই মুখে ধরা পড়ে যাওয়া হাসি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান,—এসো না, এক সঙ্গে ভিজি দুজনে! খুব খুব ভাল লেগেছিল সেদিন অনুতোষকে। কেন যে অনুতোষ সব সময়ে ওরকম থাকে না!

আবার সমুদ্রস্নানের কথা মনে পড়ে কেন? সমুদ্রে নামার আগে মেয়েরা সবাই সালোয়ার কামিজ পরে নিয়েছিলাম, ছেলেরা সুইমিং কস্টিউম। আর মধুদা ঢোল্লা এক হাফপ্যান্ট। মধুদাকে কী চাঁটান চাঁটাচ্ছিল পল্লবদারা। আহা রে, ভালমানুষ বলে মধুদাকে নিয়ে সকলে যা করে! নেহাত সহজ সোজা মন বলে হাসিমুখে সব সহ্য করে নেয়, অন্য কেউ হলে রেগে ফায়ার হয়ে যেত।

মধুদার স্নানের পোশাক নিয়ে ঠাট্টা মশ্‌করার পর পল্লবদা দুম করে আমায় নিয়ে পড়ল,—ফ্যান্টাস্টিক! দারুণ দেখাচ্ছে তোমায়! একেবারে মনীষা কৈরালা!

আমি লজ্জায় মরে যাই। বিয়ের পর থেকে সালোয়ার কামিজ আর পরিই না, নেহাত সমুদ্রে শাড়ি সামলানো যাবে না বলেই....।

বললাম,—অ্যাই মশাই, আমায় গ্যাস দিচ্ছেন কেন? নিজের বউকে দেখুন।

পল্লবদা ভুরু কুঁচকোল,—কার কথা বলছ?

—ন্যাকামি করবেন না। চোরা চোখে তো দেখছেন মিত্রাকে।

—ও আর এখন আমার বউ নয় ম্যাডাম, ও শুভ্রর বউ।

—ফের ওই ফাজলামো?

পাশ থেকে মধুদা ফস্ করে বলে উঠল,—তোরা কিন্তু আমার সঙ্গে বিক্লাসি করলি। আমার প্রাপ্য ছিল মিত্রা, টুটুল নয়।

শুনেই মিত্রা যা মুখ বেঁকাল! বন্দনাও কটকট করে তাকাল মধুদার দিকে। ওরা মধুদাকে একটুও সহ্য করতে পারে না। বেচারা বোকাসোকা মানুষ, কোথায় কী বলতে হয় জানে না, বন্ধুদের চপলতা দেখে নিজেরও তো একটু রঙ্গরসিকতা করার সাধ জাগতে পারে। বন্দনা মিত্রা কিছুতেই কথাটা বুঝতে চায় না। অনুতোষেরও বলিহারি, এদের মধ্যে কী দরকার ছিল মধুদাকে টেনে আনার?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ছেলেরা আগে গেল ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে, কবে কোনার্ক যাওয়ার বুকিং পাওয়া যায় দেখতে। আমরা তিন সখী চললাম সমুদ্রের পানে। বালির ঢাল বেয়ে নামতেই জল এসে ছুঁল পা। একটার পর একটা ঢেউ এসে ফেনার মুকুট খুলে রাখছিল পায়ের কাছে। কী অসহ্য সুখের অনুভূতি! মিত্রা আর বন্দনা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ক্ষণে ক্ষণে দামাল বাতাস এসে এলোপাতাড়ি জড়িয়ে ধরছে ওদের, চুল টুল সব উড়ে একসা।

আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম,—আহ্ মারভেলাস। আমি আর এখান থেকে ফিরব না রে, সমুদ্রেই থেকে যাব।

বন্দনা এগিয়ে আসতে আসতে বলল,—দূর, সমুদ্র বড় বোরিং। আই লাভ মাউনটেন।

—কী যে বলিস! পাহাড়ের এরকম লাইফ আছে? সমুদ্র অনেক বেশি সুন্দর।

মিত্রা অত শত তর্কে গেল না। আপোষের সুরে বলল,—আমার ভাই পাহাড় সমুদ্র দুটোই খুব প্রিয়।

হঠাৎই কোথ্‌থেকে একটা বড়সড় ঢেউ দৌড়ে এল কাছে, দ্যাখ না দ্যাখ

ছিটকে ফেলে দিয়েছে আমাদের। তিন জনই ভেজা বালিতে বেসামাল।

কোথায় খুশিতে পাগল হয়ে যাবে তা নয়, পিছিয়ে শুকনো বালিতে যেতে যেতে বন্দনা গজগজ করে উঠল,—এই জন্যই আমার সমুদ্রের কাছে আসতে ভাল লাগে না।

মিত্রা চোখ টিপে বলল,—কেন রে, ঢেউগুলো কি বেশি ইনকুইজিটিভ?

বন্দনার মুখ হাঁড়ি। আমি বন্দনাকে টানলাম জলের দিকে,—আয় না, এখানে বসে থাকবি।

বন্দনা হাত ছাড়িয়ে নিল,—ছাড় ছাড়, আমার ভাল লাগে না। ঢেউগুলো অত্যন্ত ভালগার।

বন্দনার সালোয়ার তখন হাঁটু অবধি ভেজা। বেচারা জানে না, সে সময়ে ওকে কী সুন্দর যে লাগছিল! সত্যি, বন্দনা হিংসে করার মতো সুন্দরী। মিত্রার রঙ খুব ফর্সা, ফিগারটাও চোখা, একটু অবাঙালি ধরনের, কিন্তু মুখচোখে তেমন শ্রী নেই। হয়তো মিত্রা পাশে ছিল বলেই বন্দনাকে আরও বেশি সুন্দর লাগছিল।

বন্দনার ভীতু ভীতু বিরক্ত মুখ দেখে মজাও লাগছিল আমার। আবার হাত ধরে টানলাম।

বন্দনা খেঁকিয়ে উঠল,—তোর ভাল্লাগে তুই যা না, আমায় টানছিস কেন?

—মর্ গে যা। তুই পাহাড়ে গিয়েই মর্। জলে পা ডোবালাম আমি। হাল্কা শ্লেষ ছুঁড়লাম,—বেরসিকের ডিম একটা। ঠিক আমার বরের মতো।

শেষের কথাটা যেন শুনতেই পেল না বন্দনা। উদাসভাবে বলল,—পাহাড়ে গিয়ে মরাও সুখের। পাহাড় কী শান্ত! ধ্যানগম্ভীর! আহ্, যেন রূপবান এক বলিষ্ঠ পুরুষ!

—রূপবান না হাতি। পাহাড়কে আমার গোমড়ামুখো হুঁকোমুখো হ্যাংলা বলে মনে হয়। সমুদ্রের উচ্ছ্বাস তুই পাহাড়ে কোথায় পাবি?

মিত্রা আমার দিকে আঙুল তুলল,—তুই তাহলে উচ্ছলতা ভালবাসিস? বন্দনার দিকে তর্জনী হেলাল,—আর তোর পছন্দ গাম্ভীর্য? বলেই খিলখিল হেসে উঠল,—ওদের কথা মতো তোরা তাহলে বদলাবদলিটা করেই ফ্যাল্ না। পারমানেন্টলি।

ভাগ্যিস তক্ষুনি ছেলেরা এসে গেল, নইলে বন্দনা হয়তো দৃষ্টি দিয়েই মিত্রাকে কাঁচা খেয়ে ফেলত!

পল্লবদা ঢেউ-এ আলগা লাথি মারতে মারতে এগিয়ে এল,—এখনও

এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছ তোমরা? জলে নামো নি?

আমি ঠোঁট ফোলালাম,—দেখুন না, এই মেয়ে দুটো একেবারে ভীতুর ডিম, নামতেই চাইছে না।

—ইস্, আমি মোটেই ভয় পাই না। মিত্রা চোখ ঘোরাল,—একা নামি নি, পাছে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়। যা জলের ধাক্কা! দীঘায় একবার একা নেমে যা জোর আছাড় খেয়েছিলাম! পুরো তিন দিন পিঠে ব্যথা ছিল।

—এবার তোমার কোনও ভয় নেই। শুভ্রদা মিত্রার হাত ধরে তরতর জলে নেমে গেল, —আমি এবার তোমার পার্টনার আছি, প্রাণ থাকতে চোট লাগতে দেব না। আই প্রমিস।

মিত্রার কী হি হি হাসি!

টুটুল বাবার পাশে ছিল। একবার দৌড়ে গিয়ে জলে পা ছুঁইয়েই ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে তীর বেগে পালিয়ে আসছে পাড়ে। আবার এগোচ্ছে পাঁচ পা, তো দশ পা পিছোচ্ছে। মধুদা টুটুলকে কোলপাঁজা করে তুলে নিল,—কী রে, যাবি ভেতরে?

টুটুল মধুদার গলা আঁকড়ে ধরল,—যাব যাব যাব।

বন্দনা হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল,—যা বাবা যা, তোরা প্রাণের সুখে জল খেয়ে মর্। আমি এখন একটু সূর্যস্নান করি।

শুনে অনুতোষ বলল,—সে কী, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? চলো, তুমিও নামবে।

—না না, আমার ভীষণ ভয় করে।

অদ্ভুত মেয়ে, যেই ছেলেরা এল ওমনি আর সমুদ্রকে বিশ্রী লাগার কথা বলছে না, ভয়ের দোহাই দিচ্ছে!

অনুতোষ তোয়ালেগুলো শুকনো বালিতে গুছিয়ে রেখে চশমা খুলল,—কীসের ভয়? এসো আমার সঙ্গে।

আশ্চর্য, বন্দনা উঠেও দাঁড়াল! মুখে গদগদ ভাব,—আমি কিন্তু বেশি দূর যাব না।

বলল বটে, কিন্তু অনুতোষের হাত ধরে কত দূর চলে গেছে! বুকটা আমার ভার হয়ে যাচ্ছিল। অনুতোষ কি এসে আমাকে ডাকতে পারত না? ও তো জানে আমি কতটা সমুদ্র ভালবাসি!

সবাই নেমে গেছে জলে। আমি শুধু তীরে একা। একাই যেতে পারি, কিন্তু

ইচ্ছে করছে না। অভিমান হচ্ছিল সমুদ্রের ওপর। হাস্যকর অভিমান। সমুদ্র কি এক সামান্য মানবীয় অভিমান টের পায়?

হয়তো পায়। নাহলে ঠিক তখনই পল্লবদা জলে নেমেও উঠে আসবে কেন?

—অ্যাই, তুমি দাঁড়িয়ে? চলো চলো।

পল্লবদার সঙ্গে জলে যেতে যেতে অদ্ভুত ভাবে মনটা বদলে যাচ্ছিল আমার। একবার দেখলাম বন্দনা অনুতোষকে, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছি পল্লবদার হাত।

বললাম, আমরা পাড়ের এত কাছে থাকব না। চলুন দূরে যাই, অনেকটা দূরে।

পল্লবদার হাতটা কী সবল! সত্যিকারের পুরুষের হাত বুঝি এমনই হয়। ঢেউ এলেই কী করতে হবে আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে পল্লবদা। কখনও কাঁধ ধরে আমায় তুলে দিচ্ছে ঢেউ-এর মাথায়, কখনও বা এক সঙ্গে ডুব দিচ্ছি আমরা। পলকের জন্য বেসামাল হলেই পল্লবদা ধরে নিচ্ছে আমায়, আগলে রাখছে। বড় ঢেউ এলেই বলছে, লাফাও! পায়ের তলা থেকে সর সর সরে যাচ্ছে বালি, নাকে চোখে মুখে নোনা জলের ঝাপটা, আছড়ে পড়া ঢেউ জাপটে ধরছে আমাদের দুজনকে।

অনুতোষ কি ঠিক ওই সময়ে দেখেছে আমাদের? আমি অন্তত তাকাই নি। কী দেখব? বন্দনার আহ্লাদী মুখ? তার চেয়ে পল্লবদার সঙ্গে অশান্ত উন্মাদনায় ডোবা ভাসার খেলাটা ঢের ঢের ভাল। পল্লবদার হাত কি একটু বেশি চঞ্চল ছিল তখন?

ভাবতেই গায়ে আবার পদ্মকাঁটা। ছি ছি, এসব কী চিন্তা! অনুতোষ যেমনই হোক, ওকে ছাড়া অন্য কাউকে মনে আনাও পাপ। অনুতোষের দোষই বা কী? শুভ্রদাকে নিয়ে সুখী নয় বলে বন্দনা যদি নির্লজ্জের মতো গায়ে পড়ে, কতক্ষণ আর নিজেকে সামলে রাখবে? হাজার হোক পুরুষের মন, অমন একটা মেনকা রম্ভা গোছের মেয়ে ঢলাঢলি করলে মতিভ্রম হতেই পারে।

না। অনুতোষকে ছাড়া আর সমুদ্রে নামা নেই। শত্রুরা বদলা বদলি করুক, আমার বর আমারই থাক। এক্ষুনি আমি অনুতোষকে জাগাব, জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তুলব। বলব,—আদর করো আমায়। ভালবাসো, শুধু আমাকেই ভালবাসো।

আহ্, ঘুম ভাঙে না কেন? এ যে কুম্ভকর্ণের জ্যাঠা!

কপোত কপোতী যথা

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আড্ডা চলছিল আমাদের। শুভ্রর ঘরে। মেয়েরা কেউ ছিল না, নিশ্চিন্তে কথা বলা যাচ্ছিল। ট্যুরের হিসেবপত্র মেয়েদের সামনে করার শতেক বখেড়া। কবে কোথায় যাওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা করারও ঝঞ্ঝাট অনেক, কিছুতেই মেয়েরা একমত হবে না। মাঝখান থেকে হয়তো এর সঙ্গে ওর মন কষাকষি—বিচ্ছিরি ব্যাপার। কোনার্ক যাওয়া তো ঠিকই হয়ে আছে, অন্তু চিল্কার কথা তুলছিল। গেলে হয়! মিত্রারও খুব চিল্কা দেখার শখ। তবে গিয়েই ফিরে আসার কোনও মানে হয় না, একটা দুটো দিন ওখানকার রেস্ট হাউসে থাকতে হবে! পকেট কি অত পারমিট করবে? শুভ্র অন্তুর কী এসে যায়! এ ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, ও কলেজের প্রফেসার, ফ্যাট স্যালারি পাচ্ছে...। আর মধুর তো চিন্তাই নেই। এসেছে অন্তুর ঘাড়ে চেপে, অন্তু যদি ওকে বঙ্গোপসাগরের নীচেও নিয়ে যায়, সেখানেই চলে যাবে। নাহ্, আমার মতো প্রাইভেট কোম্পানীর পেটি চাকুরের অত শখ মানায় না। যাক গে, এখন পুরী কোনার্কই ভাল। পরে যদি কোনদিন সুযোগ সুবিধে হয়.... চিল্কা তো আর পালাচ্ছে না।

একটু আগেও লোডশেডিং ছিল, মিনিট দশেক হল কারেন্ট এসেছে। কী ঘন ঘন এখানে বিদ্যুৎ যায় রে বাবা! যতক্ষণ সমুদ্রের ধারে বসেছিলাম, গোটা শহরটাই অন্ধকারে ডুবে ছিল। যেন ভূতনগর। এখনও ভোল্টেজের কী ছিরি! বালবটা জ্বলছে দ্যাখো, যেন মোমবাতি!

মিত্রা খাওয়া দাওয়ার পরই ঘরে এসে টানটান শুয়ে পড়েছে বিছানায়। ফর্সা লম্বা শরীরটা নীল চাদরের ওপর রজনীগন্ধার ডাঁটি হয়ে পড়ে আছে। খাটের গা বেয়ে ঝুলছে মোটা বেণী। বেণী, না সাপিনী? সকালে অতক্ষণ সমুদ্রে দাপাদাপি করে হাল্কা একটা লাল আভা ফুটেছে মিত্রার ফোলা ফোলা গালে, ঠোঁট দুটো যেন কমলালেবুর কোয়া।

—কী দেখছ? মিত্রা চোখ খুলেছে।

—কতক্ষণ পর আবার তোমায় একলা পাওয়া গেল। অজান্তেই আমার ঠোঁট নেমে এল মিত্রার ঠোঁটের ওপর।

চুম্বনটাকে গ্রহণ করল মিত্রা। মুখ টিপে বলল,—আমিও তো কতক্ষণ পর তোমায় একলা পেলাম।

বুকের নীচে তুলতুলে নারী শরীর, তবু কেন বুক চিনচিন? বিয়ের পর

মিত্রাকে নিয়ে সেভাবে হানিমুনে যাওয়া হয়নি। শালা, মালিক ছুটিই দেয় না। সাত দিন কোথাও গেলে ব্যাটা সাতশো টাকা কেটে নিত। বিয়ের জন্য পাঁচ দিন ছুটি দিয়েছিল বলে ঠারেঠোরে কম কথা শুনিয়েছে। এবার কত কষ্টে পটিয়ে পাটিয়ে....। আচ্ছা, এইটাই কি আমাদের হানিমুন? ভেবে নিলেই হয়।

দূর, এই হাটের মধ্যে কি মধুচন্দ্রিমা হয়? বউকে নিয়ে একটু একান্ত হলেই চারদিক থেকে আওয়াজ আসবে। সন্ধেবেলা সমুদ্রের ধারে কী ইচ্ছেই না করছিল মিত্রা শুধু আমারই পাশে এসে বসুক। অন্ধকারে বালির ওপর গাঢ় নীল সমুদ্রকে সামনে রেখে খন হয়ে বসে থাকব আমরা, মিত্রার রেশমি মাথা থাকবে আমার কাঁধে, গুনগুন গান গাইবে মিত্রা, সমুদ্রের শব্দ আর মিত্রার গুঞ্জন মিলে মিশে এক হয়ে যাবে....

—কী ভাবছ? মিত্রা আলগা টোকা দিল গালে।

—ভাবছি ওদের সঙ্গে না এসে পরে শুধু দু'জনে এলে অনেক ভাল হত। সমুদ্রকে চালচিত্র করে তোমায় নতুন করে দেখতাম।

—কাব্য হচ্ছে। তুমিই না বন্ধুদের সঙ্গে আসতে বেশি ব্যস্ত হয়েছিলে?

আহা, সে কি সাধ করে? কে না জানে, বিয়ের পর প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ শুধু বউকে নিয়েই করা উচিত! কিন্তু দল বেঁধে আসার সুবিধেটাও তো কম নয়। টাকাও বাঁচে, বেড়ানোটাও হয়ে যায়।

মিত্রার কি এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ আছে? থাকতেই পারে, নতুন বউ বলে কথা।

মন বোঝার জন্যই হাল্‌কা গলায় বললাম,—সবার সঙ্গে এসে তোমার ভাল লাগছে না, না?

—তা নয়। তবে শুধু তুমি আমি এলে আরও ভাল লাগত।

আরেকটু কাছে টানলাম মিত্রাকে,—জানো, কলেজে পড়ার সময়ে আমরা তিন বন্ধু খুউব বেড়াতাম। মধুও থাকত আমাদের সঙ্গে, কখনও সখনও। তখনই ঠিক করেছিলাম, যে সব জায়গায় বেড়াচ্ছি, বিয়ের পর সবাই মিলে বউদের নিয়েও সে সব জায়গায় যাব আমরা। অন্তত এক বার। তা মধুটার তো বিয়ে টিয়ের কোনও চান্স নেই....

মধুময়ের নাম শুনেই মিত্রার মুখ ভেঙেচুরে গেল,—ওই ক্যাবলাটাকে কেন তোমরা সঙ্গে এনেছ বলো তো?

—কেন? কী হল?

—ইডিয়টের মতো কথা বলে। ভাব দেখায় যেন কিচ্ছু বোঝে না, ওদিকে কী ড্যাবড্যাব করে তাকায়....

—না না, ভুল করছ। মিত্রার চুল ঘেঁটে দিলাম,—ওর চোখটাই ওরকম, একটু ড্যাবাড্যাবা।

—কচু পোড়া। ও একটি বজ্জাতের ধাড়ি।

এ কী ভাষা মিত্রার! মধু যেমনই হোক, সে আমার বন্ধু, তার সম্পর্কে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করা মিত্রার মোটেই উচিত নয়। বেচারা কত অভাগা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটা ঠিক বেড়ে ওঠে নি। ছোটবেলায় কী একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল মধুর, টাইফয়েড মেনিনজাইটিস ধরনের, বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারে নি, পাড়ার কাছে একটা পেনের কারখানায় লেবারের চাকরি করে। ওই অন্তুই হাত ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাথা নেই ঠিক, তবে ভয়ানক দৈহিক পরিশ্রম করতে পারে মধু। বন্ধুবান্ধবদের যাবতীয় ফাইফরমাস মধুই খেটে দেয়। ওর পিছনে লেগে হয়তো মজা পাই আমরা, কিন্তু ভালও তো বাসি। ভালবাসার দায় মিত্রার না থাক, করুণা তো করতে পারে।

ঠাণ্ডা গলায় বললাম,—শোন, তুমি মধুর সম্পর্কে যা ইঙ্গিত করছ তা কিন্তু সত্যি নয়।

—থামো তো। মিত্রা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল আমাকে,—সকালে সমুদ্র থেকে উঠেছি, ফস করে বলে দিল, তোমায় ভিজে ড্রেসে দারুণ লাগছে। ঠিক যেন কিমি কাতকার।

হো হো করে হেসে উঠলাম,—বুঝলে না কেন বলেছে?

—কেন?

—আরে, আমি তখন জয়াকে মনীষা কৈরালা বললাম, তাই শুনে শুনে.... কাল ব্যাটাকে এমন ঝাড় দেব না....

—থাক, তুমি আর সিন ক্রিয়েট কোরো না। মিত্রার বিরাগ ঝপ করে উবে গেল,—ওই বোকাটাকে তোমাদের নিয়ে আসাই উচিত হয় নি।

—না গো, তুমি জানো না, মধু ট্যুরে কত কাজে লাগে। আসার সময়ে দ্যাখো নি, কত বার ব্যাটা নামল ট্রেন থেকে? চা আনা, জল আনা, খাবার আনা.... মিত্রার গালে ঠোঁট রাখলাম,—তুমি কোনও একটা কাজ দিয়ে দেখো, কেমন গুছিয়ে করে দেবে।

—কী রকম?

—এই ধরো, তোমার এক ডজন সেফটি পিন চাই, বা তিনটে চুলের কাঁটা, কিম্বা দুটো স্যারিডন.... এখন ডেকে বলো, এক্ষুনি বাজারে ছুটবে।

—আমার দরকার নেই।

আবহাওয়াটা কি একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে না? মিত্রার গলা জড়িয়ে ধরলাম,—বাদ দাও মধুর কথা। অন্য কথা বলো।

—কী কথা?

—কাকে শেষমেশ পছন্দ করলে তুমি? অন্তুকে, না শুভ্রকে?

মিত্রা ফিক করে হেসে ফেলল। কুটুস করে একটা চিমটি কাটল আমাকে,—খুব শখ, অ্যাঁ? জয়াকে নিয়ে অতক্ষণ স্নানলীলা করেও আশ মেটে নি?

—হিংসে হচ্ছে?

—হিংসে করতে আমার বয়েই গেছে। হিংসুটে তো তুমি। কেন জয়াকে নিয়ে নেমেছিলে আমি জানি না?

—কেন বলো তো?

—শুভ্রদা আমাকে নিয়ে নামল, তাই।

ছদ্ম গাম্ভীর্য আনলাম মুখে,—আমার তো হিংসে হওয়ারই কথা। আমার মিষ্টি বউটাকে নিয়ে শুভ্র জলকেলি করবে....

—এই ছিঃ। শুভ্রদা না আমার দাদার মতো?

—আহা, লজ্জা পাচ্ছ কেন? ....ধরে নাও, জয়াও আমার বোনের মতো। ব্যস্, কাটাকুটি হয়ে গেল।

মিত্রার শরীরটা ওমে গলে গলে যাচ্ছে। এখন ওকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। আমার হাত মুখ ঠোঁট কিছুই আর এখন আমার বশে নেই। মিত্রারও না।

বুকে লেপটে থেকেই মিত্রা ফিসফিস করল,—যাই বলো, তুমি কিন্তু বেশ ব্যাকডেটেড আছ।

—কেন?

—এত পজেসিভ হবে কেন? শুভ্রদার সঙ্গে একটু চান করলে কি আমি ক্ষয়ে যাব?

—যাবেই তো, যাবেই তো। তুমি আমার ফিক্সড ডিপোজিট, সেখানে আমি অন্যের হাত সইব কেন?

—ফের সেকেলে লোকদের মতো কথা?

মিত্রার তেজী, অথচ প্রেমে আপ্লুত দুই চোখ যে কী অপরূপ এখন! আর একটু উস্‌কে দিতে ইচ্ছে করল মিত্রাকে। বললাম,—পজেসিভনেস কিন্তু ছেলেদের থেকে মেয়েদেরই বেশি।

—কক্ষনো না। তোমরাই সব সময়ে আমাদের সম্পত্তি ভাবো। নইলে বউ পাল্টানোর প্ল্যান মাথায় আসে?

এবার পুরোপুরি চুপ করিয়ে দিলাম মিত্রাকে। এখন কথা বলার সময় নয়, এখন প্রেম করার সময়। শরীরে ডুব দেওয়ার সময়।

কতটা সময় যে বয়ে গেল কে জানে! ব্যালকনি দিয়ে একটা নরম ঠাণ্ডা হাওয়া এল ঘরে, ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদেরই ঘিরে। সমুদ্রের স্বর শুনতে পাচ্ছি আমরা, যেন এক অলৌকিক গান হয়ে বাজছে।

হাই তুললাম একটা। উঠে বসে সিগারেট ধরালাম। মিত্রা শুয়ে আছে পাশে, চোখ বুজে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। ওই হাসিকে কী বলে? সুখ? তৃপ্তি? আনন্দ?

একটু পরে মিত্রা বলে উঠল,—এই, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—এখনও কথা আছে? আমি হাসলাম,—আমি কিন্তু ওয়ার্ক মোর টক লেসেই বিশ্বাসী।

—এই, ফাজলামি নয়। বলো না গো, শুভ্রদার সঙ্গে বন্দনার গণ্ডগোলটা কী নিয়ে?

অস্বস্তিকর প্রশ্ন। মিত্রা আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নতুন মিশছে, এখনই তাদের সম্পর্কে কিছু উল্টো সিধে ধারণা করবে, সেটা কি ভাল?

যা হোক কিছু বলার মতো করে বলে দিলাম,—কী কেস আমিও ঠিক জানি না। তবে মনে হয় ওই ছেলেপুলে না হওয়াটাই....

—ডাক্তার দেখায় নি?

—শুনেছিলাম তো একবার দেখাচ্ছে। আমি এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি না। তবে শুভ্রর থেকে বোধহয় বন্দনা অনেক বেশি ফ্রাস্‌ট্রেডেড।

—স্বাভাবিক। মেয়েরা মা হতে না পারলে আপসেট হয়ে যায়।

মিত্রা সামান্য চুপ। ভাবছে কী যেন। হঠাৎ বলল,—ওদের লাভ ম্যারেজ না?

—লাভ ম্যারেজ কী গো? বলো সুপার লাভ ম্যারেজ। সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে মিত্রার পাশে শুয়ে পড়লাম,—ওদের প্রেম কলেজে একটা দারুণ সেন্সেশান ছিল। বন্দনাকে বিয়ে করল বলে শুভ্র তাড়াহুড়ো করে চাকরি জোগাড়

করে ফেলল, এম. এস. সি. টা পর্যন্ত কমপ্লিট করল না। ওর যা মেরিট ছিল, তাতে কি শুধু ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হওয়ার কথা? শুভ্রও অন্তুর মতো প্রফেসার হতে পারত, যদি তক্ষুনি তক্ষুনি মাথাচাড়া দিয়ে না উঠত খ্যাপামিটা। কী কাণ্ড করে ওরা যে বিয়ে করেছে আমরা তো জানি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম কী একটা যেন কেলো হয়েছিল।

নব পরিণীতা বউ-এর মুখে কেলো শব্দটা কানে খট করে বাজল। বিশেষত বিছানায়, এই আবেগঘন মুহূর্তে। মাঝে মাঝেই মিত্রার মুখ দিয়ে এরকম রকের ভাষা বেরিয়ে যায়।

চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করলাম,—কেলোর খবর তুমি কী করে পেলে?

—জয়া একদিন কী যেন প্রসঙ্গে বলছিল, পুরোটা শোনা হয়নি। কী কিচাইন হয়েছিল বলো না গো?

কিচাইন শব্দটাও কানে টুসকি মেরেছে। হেসে ফেলে বললাম,—সে এক ইতিহাস। হঠাৎ একদিন দুপুরে শুভ্র আমার বাড়িতে হাজির। মুখ থমথম, ঘাড় ঝুলে গেছে... যাকে তোমার ভাষায় বলা যায় বিলা থোবড়। কী, না বন্দনাকে আর পাওয়া হল না। বন্দনার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, মাঝে আর মাত্র নটা দিন, পাছে শুভ্রর সঙ্গে বন্দনা যোগাযোগ করে, মা বাবা ঘরে শিকল তুলে আটকে রেখেছে মেয়েকে। সুতরাং শুভ্রর আর প্রাণধারণ বৃথা, এক্ষুনি ওর সঙ্গে আমাকে হাওড়া ব্রিজে যেতে হবে, ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে ওকে।

—যাহ্।

—যা নয়, হ্যাঁ। ....আমি তো চিন্তায় পড়ে গেলাম। খিঁচিয়ে উঠে বললাম, অ্যাদ্দিন কী করছিলি? শুভ্র বলল, বিশ্বাস কর্, আমি জানতাম না। দু দিন বন্দনা আমার সঙ্গে ডেট ফেল করল, আমি ওকে বাড়িতে ফোন করলে হয় ওর বাবা নয় ওর মা তোলে, আর সঙ্গে সঙ্গে রেখে দেয়, তখনই আমার মনে হল ডালমে কুছ কালা হ্যায়। ওদের ক্লাসের সীতা, ওই যে কেলেকুষ্টি মেয়েটা, যাকে আমরা শাঁকচুন্নি বলতাম, ওকেই জপিয়ে জাপিয়ে পাঠালাম বন্দনার বাড়ি, ব্যস্ কেস্ কট।

—তার মানে বন্দনার সেই বিয়েতে সায় ছিল?

—মোটেই না। কোথায় কোন্ বিয়ে বাড়িতে দেখে ওকে নাকি পছন্দ করে ফেলেছিল ছেলের বাপ, তার থেকেই একেবারে নহবতখানার অর্ডার হয়ে গেছে। ....হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম। শুভ্রকে বললাম, খ্যাপামি করিস না, অন্তুর

কাছে চল্, একটা কিছু সলিউশন বেরোবেই। গেলাম....। অন্তু শুনল চুপচাপ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, যার সঙ্গে বিয়ে তার অ্যাড্রেস তোর কাছে আছে? শুভ্র কাঁচুমাচু মুখে বলল, না রে, বন্দনা আমায় একটা চিরকুট পাঠিয়েছে। তার থেকে শুধু জানি পাত্র শিবপুর বাজারের কাছে থাকে। অন্তু বলল, ওতেই হবে। চল্, একটা ট্যাক্সি ধর।

—তার পর?

—তারপর সে কী গরু খোঁজা রে ভাই। মাংসের দোকান, ফলঅলা, লণ্ড্রী, সেলুন, সর্বত্র সন্ধান করতে করতে শেষে হদিশ পাওয়া গেল। রাস্তাটার নাম এখনও মনে আছে। রাজা রাজনারায়ণ রায়চৌধুরী ঘাট রোড। সে এক আদ্যিকালের পেল্লায় বাড়ি। তার নাম আবার বাতাসী মঞ্জিল। জয় মা বলে ঢুকলাম বাড়িটায়। কপালগুণে পাত্রটাও ছিল বাড়িতে। অন্তু তাকে স্ট্রেট বলল, আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে, এক্ষুনি বাইরে চলুন। অন্তুর চেহারায় জৌলুস তো আছেই, লোকটা ভড়কে গেল, নার্ভাস মুখে আমাদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এল। আমি লোকটাকে বললাম, আপনি জেনেশুনে দুটো মানুষের মৃত্যু চান? লোকটা আমতা আমতা করে বলল, কেন, এ কথা বলছেন কেন? অন্তু বলল, জানেন যার সঙ্গে আপনার বিয়ের ঠিক হয়েছে সে অন্যপূর্বা? বন্দনা মোটেই আপনাকে বিয়ে করতে চায় না। লোকটার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। কী যেন ভাবল একটু। তারপর উদাস মুখে বলল, কিন্তু বিয়ে তো স্থির হয়ে গেছে, আমার আর এখন কিছু করার নেই। আমি বললাম, এত কিছু জানার পরও আপনি বিয়ে করবেন? লোকটা... তুমি মাইরি বিশ্বাস করবে না, অম্লান বদনে বলল, বিয়ের আগে কত মেয়েরই তো ওরকম লটঘট থাকে, স্বামীরা কি সব জানতে পারে? আমি নয় ধরে নেব, আমি কিছু শুনি নি।

—এমা ছি ছি...। মিত্রা আমার গা ঘেঁষে এল, —কী নির্লজ্জ লোক রে বাবা!

—কারেক্ট। এই কথাটাই আমরা বললাম লোকটাকে। বললাম, অত কানকাটা হবেন না। এই যে যুবকটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এই হল বন্দনার প্রেমিক। কাবাবমে হাড্ডি বনে দুটো নির্মল প্রাণকে বিনষ্ট করার আপনার কোনও রাইট নেই। লোকটা কটকট করে দেখল শুভ্রকে। হয়তো মায়া হল। ভয়ও পেয়ে থাকতে পারে, শুভ্রর তখন ফিজিকটা আরও ভাল ছিল। মিনমিন করে বলল, দেখুন ভাই, বিয়ে তো ঠিক করেছেন আমার বাবা। বিয়ে দেওয়ারও মালিক তিনি, ভাঙারও মালিক তিনি। বড়বাজারের পগেয়া পট্টিতে চলে যান, ওখানে

আমাদের কাপড়ের দোকান, বাবাকে পেয়ে যাবেন ওখানে, তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।

মিত্রার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। যেন কোনও রহস্য উপন্যাস শুনছে। মুখ হাঁ করে বলল,—তোমরা গেলে?

—অফ-কোর্স। তখন আমরা শুভ্রর জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছি। যদি সাহারা মরুভূমিতে যেতে বলত, সেখানেও যেতাম।

ভদ্রলোক শুনেই বিয়ে ভেঙে দিলেন?

—আরে নাহ্। সে এক মহা তিক্ড়ম লোক। শুনেই তার কী লম্ফঝম্প! কক্ষনো না, বিয়ে আমি ভাঙব না! তোমরা কোথাকার কোন্ অপগণ্ড, আমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি, চাবকে তোমাদের লম্বা করে দেবে! শুভ্র তো নার্ভাস হয়ে বলেই ফেলল, চল্ কেটে পড়ি। দেখি কোনও ভাবে বন্দনাকে ইলোপ করা যায় কিনা। কিন্তু অন্তু ওই মোমেন্টে স্ট্যামিনা দেখাল বটে। কিছুতেই জমি ছাড়ল না। লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল, আপনি আমাদের কেটে কুচি কুচি করে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে পারেন, কিন্তু তাতে সত্য মরবে না। এবং আপনার ছেলেও সুখী হবে না। বন্দনার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, ও ফুলশয্যার রাতে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাবে। চিঠিও লিখে রাখবে হয়তো, আমার মৃত্যুর জন্য দিজ দিজ পারসনস্ আর দায়ী। এখন ভেবে দেখুন আপনি কী করবেন, আমরা চলি। ব্যস্, রাত এগারোটার সময়ে বন্দনার বাবা মা মুক্তকচ্ছ হয়ে শুভ্রর বাড়ি উপস্থিত। বিয়েটাও হয়ে গেল। ওই দিনই। তবে শুভ্রর বাবা খুব জিদ্দি আদমি তো, বলল তুমি কোথায় লভ করে ফেঁসেছ, তার জন্য তোমার বউকে আমায় খাওয়াতে হবে, আমি সে পার্টি নই। তিন মাস টাইম দিলাম, এর মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াও। নয়তো দু'জনে ওই গাছতলায় গিয়ে থাকবে। ব্যস্, শুভ্ররও এম. এস. সি-র পাট চুকে গেল। প্রথমে একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করল, তারপর ব্যাঙ্কে পরীক্ষা দিয়ে ক্যাশিয়ার। কাহিনী শেষ।

মিত্রা নীরব হয়ে গেছে। নখ দিয়ে নখ খুঁটছে, অন্য মনে।

বললাম,—কী, দারুণ রোমহর্ষক এপিসোড নয়?

—হুঁ।

—এই হল গিয়ে ভালবাসা। প্রেম। বুঝলে?

—হুঁ। ...কিন্তু সেই গভীর প্রেমেও চিড় ধরে!

এবার কথা নয়, কথার সুরটা কানে বাজল। যেন আমার আদুরে বউ নয়,

কোনও পরিণত নারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমারও শ্বাস পড়ল একটা। বললাম,—তাই তো দেখছি। প্রেম ট্রেম বোধহয় খুব পল্‌কা শব্দ। মানুষ কি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কখনও ভালবাসে? স্বার্থে ঘা লাগলে, চাওয়া পাওয়ায় গরমিল হলে, সমস্ত সম্পর্কই চিড় খেয়ে যায়।

মিত্রা যেন কেঁপে উঠল, ভীতু পাখির মতো। বলল,—আমাদেরও কি এমনটা হতে পারে কোনও দিন?

মিত্রার নাকে নাক ঘষে দিলাম,—আমি হতে দেবই না। আমরা চিরটা কাল হানিমুন কাপল্‌ থাকব, দেখো।

আর কথা বলল না মিত্রা, উঠে বসল। বিছানায় পড়ে থাকা সালোয়ার কামিজ জড়ো করছে দু হাতে, ভাঁজ করে খাটের বাজুতে রাখল। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। দেখছে নিজেকে। গায়ে সুতোটি নেই মিত্রার। স্বচ্ছন্দ পায়ে হাঁটছে ঘরে। যেন মানবী নয়, যেন জল থেকে উঠে এসেছে ভেনাস, কোনও যাদুমন্ত্রে ঢুকে পড়েছে এ ঘরে। ঈষৎ অবনত স্তন, রূপোর পিরিচের মতো নাভিদেশ, শঙ্খধবল উরু—কে এই মায়াবিনী!

বুক ধড়াস ধড়াস করছে আমার। শুধু এই মুহূর্তটাই কি অনন্তকাল হতে পারে না?

মিত্রা আমার মনের কথা কিছুই টের পেল না। নিজের খেয়ালে বাথরুমে ঢুকে গেল। ফিরে এসে নাইটি পরে নিয়েছে। বসল বিছানায়। আবার সে এক সামান্য মানবী।

সামান্য মানবীর মতোই বলল,—যাই বলো, তোমাদের বন্দনা কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে। যন্ত্রণাটা তো ওর একার নয়, শুভ্রদারও কষ্ট আছে।

আমিও রূঢ় বাস্তবে ফিরেছি। মাথা নেড়ে বললাম,—শুভ্রর জন্য একটু বেশি খারাপ লাগে। বন্দনা ওকে যেখানে সেখানে এমন বিশ্রী ভাবে হার্ট করে, যখন তখন রাফ বিহেভ্‌ করে....অথচ শুভ্র, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজও বন্দনাকে তেমনই ভালবাসে।

—শুভ্রদা ভীষণ ভীষণ ভাল। এত হাসিখুশি, এত লাইভ্‌লি, কে বলবে মানুষটাকে এত হিউমিলিয়েশান সহ্য করতে হয়!

—বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু....আমার ধারণা, শুভ্র সব কিছু ভুলে থাকতে চায়।

মিত্রা ঝেঁঝে উঠল,—বন্দনা ওকে ভুলে থাকতে দিলে তো! দেখলে না, আজ সকালে কী কুচ্ছিত ভাবে অন্তুদার সঙ্গে ঢলাঢলি করছিল!

ছি ছি ছি, মিত্রাও লক্ষ করেছে? অবশ্য দেখবে না'ই বা কেন, মেয়েদের চোখ এ সব ব্যাপারে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়। অন্তু আর বন্দনার মধ্যে কোনও রিলেশান গড়ে উঠেছে কিনা খোদাই মালুম, আশা করি ওদের মধ্যে কিছু নেই। কিন্তু যদি কিছু হয়ে থাকে, শুভ্রর থেকে বেশি আঘাত পাবে জয়া। এত ভাল মেয়ে, হয়তো কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে। এত মিষ্টি মেয়ে জয়া, এত সরল, সাদাসিধে! জয়ার মতো ওরকম একটা নরম মনের মেয়ে পেলে সব পুরুষই সুখী হতে পারে। কী যেন একটা আলাদা চার্ম আছে জয়ার। মিত্রার মতো নয়, অন্য রকম।

—এই, কী ভাবছ গো?

—কিছু না তো। চমকে উঠলাম।

মিত্রা ঝুঁকল আমার দিকে। আলগোছে জড়িয়ে ধরল গলা,—এই, আমাদের ভালবাসা যদি কখনও ফুরিয়ে যায়....?

কথাটা শেষ করল না মিত্রা। হঠাৎ থেমে গেছে। মুখচোখও কেমন বদলে গেছে মিত্রার। যেন সেই অচেনা ভেনাস আবার উঁকি দিচ্ছে!

আমি আচ্ছন্নের মতো বললাম,—চুপ। ও কথা বলতে নেই।

সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে। জোয়ার আসছে বোধহয়। আমাদের এই ঘরেও যেন ঢুকে পড়ছে জোয়ার।

আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

সাগরের মুখোমুখি

সন্ধে নেমেছে।

গাঢ় নীলাম্বরী পরে চঞ্চল অভিসারিকার মতো ছটফট করছে সমুদ্র। তীরে এসে আছড়ে পড়ছে পায়ের নূপুর, শব্দ বাজছে ঝুমঝুম ঝুমঝুম।

মনটা বড় চঞ্চল আমারও। যেন আমার মন আমারই বশে নেই। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ, ডুবডুব ডুবডুব। আজ সকালে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, তার জন্য কে দায়ী? আমি? বন্দনা? শুভ্র? অন্তহীন জলরাশির সামনে বসে প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। নিজেকে গোপন রাখা বড় কঠিন এখন।

আমি, আমিই অপরাধী।

তটভূমির এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। পিছনে উঁচু বালিয়াড়ি, লোকজন তেমন আসছে না এদিকে। আছি শুধু আমরা ক'জন। এখনও চাঁদ ওঠে নি, নীলচে অন্ধকারে সমুদ্র এখন আরও রহস্যময়। ছোট ছোট ঢেউ ফেনা ছড়িয়ে চিকচিক করে উঠছে। হঠাৎ হঠাৎ। দূরে দূরে। আচমকা মনে হয় যেন জলকন্যারা মাথা তুলল।

—অ্যাই অন্তু, সিগারেট আছে?

শুভ্র। অকারণ চমকটা সামলে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম।

শুভ্র প্যাকেট রাখল না। একটা সিগারেট বার করে নিয়ে ফিরিয়ে দিল। গলা ঝেড়ে বলল,—একটাও চাঅলা আসছে না কেন বল্ তো?

সত্যি, এখন একটু চা পেলে ভাল হত। কিন্তু জুটছে কোথায়? যা দু' চারটে ফেরিঅলা আসছে, তাদের হাতে শাঁখ, নয় ঝিনুক। একটু আগে জয়া আর মিত্রা একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ঝিনুকের মালা নিয়ে দরাদরি করছিল। মেয়েদের জন্যই ফেরিঅলারা আসে বেশি।

মধু ভেজা বালিতে চিৎ হয়ে শুয়ে। বেচারার শরীরটা সকালে ভাল ছিল না, তার ওপর বিকেলে যা জোর একটা ঝাড় খেল পুলুর কাছে! বন্দনাকে নিয়ে পুলু বুঝি হাঁটতে বেরিয়েছিল, মধু নাকি তখন ধাওয়া করেছিল ওদের! ইচ্ছে করে! কড়া ধমক খেয়ে বেচারার কী কাঁচুমাচু দশা! এখন অবশ্য দিব্যি ভুলে গেছে, খেলা করছে টুটুলের সঙ্গে। টুটুল আঁজলা ভরে বালি তুলে মধুর বুকপকেটে ভরে দিচ্ছে, মধু ঝেড়ে ফেলছে পকেট থেকে, টুটুল আবার ভরছে। বাচ্চারা মধুকে বড় তাড়াতাড়ি ভালবেসে ফেলে। মধুও।

শুভ্রর দু' পাশে বন্দনা আর জয়া। না, বন্দনা ঠিক পাশে নয়, খানিক তফাতে। মিত্রা পুলু আরও দূরে। নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন ওরা তো একটু আলাদা আলাদা থাকতে চাইবেই। তা বলে বেশি আদিখ্যেতা দেখানোরও মানে হয় না। সবার সঙ্গে যখন এসেছিসই, একটু মানিয়ে গুনিয়ে চলা উচিত নয় কি? না এলেই পারতিস।

আমারও কি আসাটা ঠিক হয়েছে? এ ভাবে দল বেঁধে না এলে হয়তো ঘটনাটা ঘটত না। বন্দনাকে দোষ দিই না, সে বেচারা হয়তো কোনওভাবে একটু শান্তি চাইছে, পালাতে চাইছে শুভ্রর কাছ থেকে। এত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারাল বন্দনা?

অস্বীকার করব না বন্দনার ওপর এক কালে আমারও দুর্বলতা ছিল। নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাই নি, তার আগেই বন্দনা শুভ্রর হয়ে গেল। মনের ইচ্ছে মনেই মেরে ফেললাম আমি। প্রিয় বন্ধুর প্রেমিকার দিকে ভুলেও হাত বাড়াবে, অনুতোষ রায় চৌধুরীর সে ধাতই নয়। সত্যি কথা বলতে কি, বুকে তখন কাঁটা খচখচ করলেও খুশিও কি হই নি আমি? কেন হব না? শুভ্রর মতো দরাজদিল ছেলে ক'টাই বা আছে দুনিয়ায়? পুলুর ভেতরে তাও কিছু কিছু ছোট ছোট নীচতা আছে, স্বার্থপরতা আছে। টাকাপয়সার ব্যাপারে তো রীতিমত ছ্যাঁচড়া, যত টাকা দিচ্ছে তার পাইপয়সা প্রতি স্টেপে বুঝে নিচ্ছে। কোথায় কোন্ ট্রাভেল এজেন্সি কোনার্ক ট্যুরে পাঁচ টাকা কম নেবে, পুলু সেখানেই ছুটল। এত চমৎকার হোটেল তাও ব্যাটার মন ওঠে না। কথায় কথায় বলছে, শালারা চামার, গলায় গামছা দিয়ে পয়সা আদায় করে! মাংস কেন তিন পিস দেয়, চিকেনটা কেন বুড়ো....! শুভ্র একদম আলাদা। আজও আমি বললে আমার সামান্য উপকারের জন্য জান লড়িয়ে দেবে। এ কি শুধুই কৃতজ্ঞতাবোধ? ওদের বিয়েটা ঘটিয়ে দিয়েছিলাম বলে? কক্ষনো না। আবেগ ভালবাসা পরোপকার শুভ্রর রক্তে আছে, জানি আমি। তবু শুভ্রর জীবনটাই কেন এমন হয়ে গেল? কেন ওরা অত অসুখী?

বন্দনা যা বলল তা কি সত্যি? হতেও পারে। একটা মানুষের তো অজস্র চেহারা থাকে। আমরা হয়তো একটা মুখ দেখি, বন্দনা দেখে আরেকটা মুখ, ওর অফিসের লোকজন দেখে আরও একটা! বাইরে থেকে দেখে স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্পর্ক আন্দাজ করা অত সহজ নয়।

শুভ্র অনেকক্ষণ নিশ্চুপ। সিগারেট শেষ, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

কেমন একটু ঝুঁকে বসে। সমুদ্রের ধারে এলে মানুষ এমনিতেই স্তব্ধ হয়ে যায়, নিজের তুচ্ছতা অসহায়তা বড্ড বেশি মনে পড়ে, শুভ্র কি সেই কারণেই চুপ? চুপ, নাকি গুম?

কিছু কি আন্দাজ করেছে শুভ্র?

সকালে টুটুলকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে গেল জয়া। মিত্রা পুলু আর শুভ্রও গেল সঙ্গে। মধুটার কাল রাত থেকে একটু পেট গড়বড়, নিজের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি কেন গেলাম না জয়াদের সঙ্গে? ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই ঠিকই, কিন্তু মন্দির ঘুরে দেখতে তো দোষ ছিল না!

কেন মনকে চোখ ঠারিস অনুতোষ? বন্দনা রয়ে গেল বলেই তো তুই....

মোটেই না। বন্দনা হোটেলে থাকবে আমি জানতামই না।

মিথ্যে কথা। ব্রেকফাস্ট টেবিলেই বন্দনা বলেছিল মাথা ধরেছে, সকালে কোথাও বেরোবে না।

আমি অত খেয়াল করি নি। তখন টুটুলকে খাওয়াচ্ছিলাম।

ড্যাম লাই। তুই জেনেশুনে....

দুটো স্বর ভেতরে যেন ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। ঝগড়া করছে গলার শির ফুলিয়ে। একটা স্বর গর্জে উঠল, বেশ করেছি। নয় জেনেশুনেই ছিলাম। তাতে হয়েছেটা কী? মেয়েটা অসুস্থ, একজন কারুর তো থাকা উচিত।

অন্য স্বর খলখল হেসে উঠল, যাক, সত্যিটা স্বীকার করলি তাহলে? ....বাই দি বাই, বন্দনার মাথাব্যথা কবে থেকে তোর চিন্তার এক্তিয়ারে এল? কাল হাত ধরাধরি করে সমুদ্রস্নানের পর থেকে?

চোপ, একদম চুপ!

কাকে চোখ রাঙাস অনুতোষ? শরীরে শরীর ছোঁয়াতেই বদলে গেলি? নাকি সমুদ্রের ঢেউ বুকে ঢুকে গেল, অ্যাঁ?

অন্য স্বর নীরব। নিথর। আবার হৃৎপিণ্ডে শব্দ বাজছে, ডুবডুব ডুবডুব, ডুবডুব। সকালটা দুলে উঠল চোখের সামনে....

....বন্দনার ঘরে টোকা পড়ল।

—কে?

—আমি। অন্তুদা।

—ও, আসুন।

উঠে বসে কাপড় চোপড় ঠিক করছিল বন্দনা। শুভ্রর সঙ্গে সকালেই আবার

ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল হয়তো। একা শুয়ে কি কাঁদছিল? দুগালে যেন তার অশ্রুচিহ্ন?

অপ্রস্তুত মুখে বললাম,—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথাধরা কমেছে কিনা দেখতে এসেছিলাম।

—না না, এখন ঠিক আছি। বসুন।

তখনই কি আমার ফিরে আসা উচিত ছিল? মন তো সেরকমই বলছিল, তবু কেন চেয়ারে বসলাম? কথাও খুঁজে পাচ্ছি না, উঠেও আসতে পারছি না, কী যে এক উদ্ভট দশা তখন। নৈঃশব্দ্যও যে কখনও কখনও মানুষকে এত বিভ্রান্ত করে তোলে।

বন্দনাই বাঁচাল। বলে উঠল,—অন্তুদা, কী করি বলুন তো?

—কীসের কী করবে?

—আমার আর আজকাল কিচ্ছু ভাল লাগে না।

কথাটা বাতাসে ভাসতে লাগল। যেন ভাল না লাগার কষ্টটা চাপা গুমোট হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল ঘরে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—তোমাদের কী হয়েছে বলো তো?

—কিছু বোঝেন না? একটু আগের কান্না যেন আবার মুক্তোবিন্দু হয়ে জমাট বাঁধল বন্দনার চোখে। চাপা স্বরে বলল,—আপনাকে অন্তত একটু অন্য রকম ভেবেছিলাম। সেন্সেটিভ। সিরিয়াস।

ভীতু গলায় বললাম,—প্রবলেমটা কী খুলে বলো না।

—প্লিজ, আমি কী করব আপনি বলে দিন। আমি আর শুভ্রর সঙ্গে থাকতে পারছি না।

ভাবতেও পারি নি কথাটা এত সরাসরি বলবে বন্দনা। বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না আমার। বুঝতে পারছিলাম না ঠিক এই মুহূর্তে আমারই বা কী বলা উচিত।

—অ্যাম আই টু বিলিভ, আপনারা কিচ্ছু বোঝেন না? আমরা কেউ আর কাউকে সহ্য করতে পারি না আজকাল।

—কেন?

—কেন আবার কী, শুভ্র আমায় বিশ্বাস করে না। সন্দেহ করে। যাচ্ছেতাই ভাষায় গালিগালাজ করে, যখন তখন। বন্দনা স্পষ্টতই উত্তেজিত। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানলায় গিয়ে স্থির। ফিরল, এবং আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল,—সবার কাছে আমায় দোষী সাজিয়ে ও ভালমানুষ সাজতে চায়। শুভ্র যে কত বড়

হিপোক্রিট আপনারা জানেন না। আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। আমি এখন একটা নরকে বাস করি অন্তুদা, নরক।

কেন সন্দেহ করে শুভ্র? কাকে নিয়ে সন্দেহ করে? প্রশ্নটা মনে এলেও ঠোঁট নড়ল না। যদি বন্দনা বলে শুভ্রর সন্দেহের লোকটি আমি নই, অন্য কেউ, সেটা বুঝি আরও গভীরভাবে বিঁধবে আমাকে।

বন্দনার দু' গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় ফোঁটায়। রক্তকরবীর পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম কোনও এক অবচেতনায় বন্দনার প্রতি দুর্বলতাটা আমার রয়েই গেছে। এমনটাই বোধহয় হয়। সব কিছুই তো চিরকাল বুকেই জমে জমে থাকে আমার। জমে পাথর হয়ে যায়, কিন্তু মরে না। আশা আকাঙ্ক্ষা ক্ষোভ দুঃখ...। হয়তো গোপন কামনাও। বাবা মারা গেছে কোন্ ছোটবেলায়, তার মুখটাও মনে পড়ে না। মা ব্যস্ত থাকত কাজে, স্কুল টিউশ্যনি মিলিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম। আমাকে তেমন সময় দিতে পারত কই! শৈশব আমার কেটেছে একা একাই। হয়তো সেই জন্যই আমি এরকম। আমার ইনট্রোভার্ট নেচারটাকে লোকে অহঙ্কার বলে ভাবে। চাকরির জায়গার লোকেরা, আমার বন্ধুরা, এমনকি জয়াও। কিন্তু কী করব আমি? আমি যে আমার মধ্যেই থাকতে ভালবাসি।

বন্দনা সামনে এসে বসল। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে ফেলল সহসা। শাড়ির আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের হাতাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল,—দেখুন আপনার বন্ধুর কীর্তি। দেখুন, কীভাবে ছ্যাঁকা দিয়েছে আমাকে। সিগারেট দিয়ে।

দগদগ করছে পোড়া দাগ। টাটকা। শিউরে উঠলাম,—এ কী, এমন কেন করেছে?

—মেজাজ। ইচ্ছে। নিজেই বলল বউ বদলা বদলির খেলা খেলি, অথচ আপনার সঙ্গে সমুদ্রে গেছি বলে.... ও একটা ইমপসিবল্ ধরনের মানুষ। ওর সঙ্গে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে এক ছাদের নীচে বাস করতে পারবে না।

বন্দনার মাথায় হাত উঠে গেল আমার,—কেঁদো না, কেঁদো না। আমি তো আছি। দেখছি, দেখছি সব।

বন্দনা আমার হাতটা তুলে নিয়ে মুখে চেপে ধরল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,—অন্তু, অন্তু....অন্তু, আমায় বাঁচাও। প্লিজ বাঁচাও।

এমন একটা পরিস্থিতি যে জীবনে কখনও আসবে স্বপ্নেও ভাবি নি। কী করব

বুঝে উঠতে পারছি না। হৃৎপিণ্ড তড়াং তড়াং লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

সমস্ত সংযম ছিঁড়ে গেল। এতদিনের শিক্ষা দীক্ষা, চর্চিত অন্তর্মুখীনতা কোথায় ভেসে গেল। যেন হৃদয়ের অতলে কবেই হারিয়ে যাওয়া কথাটা বেরিয়ে এল,—আমি তোমায় ভালবাসি বন্দনা, বিশ্বাস করো। কোনও দিন মুখ ফুটে বলতে পারি নি....। তুমি এভাবে কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়।

বন্দনা পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল আমায়। পাগল, না কুহকিনী? কুহকিনী, না সাপিনী? নাকি এ এক অসহায় লতা, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে মহীরুহকে? কতক্ষণ আমাদের ঠোঁটে ঠোঁট মিশেছিল? কতক্ষণ থেমে ছিল সময়?....

বন্দনা এখন দু' হাঁটুর মাঝে থুতনি ঠেকিয়ে সাগরমনস্ক। তরল অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। ওর দিকে আর সোজাসুজি তাকাতে পারছি না আমি। কেন পারছি না? সংকোচ? লজ্জা? আত্মধিক্কার? বড় বেশি নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে। অন্ধকারের আয়নায় নিজের মুখ দেখে আমি চমকে চমকে উঠছি। এতই যদি বন্দনার ওপর দুর্বলতা ছিল, কেন বিয়ে করেছিলাম জয়াকে? নয় নয় করে পাঁচ পাঁচটা বছর ঘর করছি আমরা, টুটুলের মতো একটা ফুটফুটে মেয়ে রয়েছে আমাদের, নিটোল সুখী দম্পতি বলে ভাবি নিজেদের, সবটাই তাহলে ফাঁকি? জয়ার ওপর কোনও টান নেই আমার? সে কি শুধুই শরীর?

জয়া জানলে কী ভাববে? শিশুর মতো সরল জয়া, আমি ছাড়া দুনিয়াটাকে ভাবতেই পারে না। ওকে প্রতারণা করার কী অধিকার আছে আমার?

আবার প্রতিস্বর জেগে উঠছে বুকে। ও ভাবে ভাবছিস কেন অনুতোষ? জয়াকেও ভালবাসিস তুই, তোর মতো করে ভালবাসিস। এক জনকে ভালবাসলে কি আরেক জনকে ভালবাসা যায় না? পুরুষের হৃদয় কি এত ক্ষুদ্র কুঠুরি, যে একজনকে রাখলে দ্বিতীয় জনকে সেখানে ধরবে না? জয়াকে আঘাত দিস না, কিন্তু বন্দনাকেও পাশে রাখ। শুধু একটু সতর্ক থাকলেই হোল।

টুটুল দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কোথ্থেকে এক বেলুনঅলাকে জোগাড় করে এনেছে, জয়ার কাছে বায়না ধরেছে বেলুনের।

জয়া চাপা স্বরে ধমকাল। কাঁদ কাঁদ মুখে মধুময়ের পাশে বসে পড়ল টুটুল। মধুময় ছুটল বেলুনঅলার পিছু পিছু। দু' হাতে দু'খানা বেলুন কিনে ফিরছে, গাল ভর্তি হাসি। টুটুল বেলুন হাতে উচ্ছল, ছুটছে এদিক ওদিক, ঘুরে ঘুরে সব্বাইকে বেলুন দেখাচ্ছে।

উঠে জয়ার পাশে এসে বসলাম। নীরবে আকাশের তারা গুনছি। মেঘহীন আকাশে শলমা চুমকি টিপ টিপ। এখনও চাঁদ উঠল না।

—কী ভাবছ? জয়া নীচু গলায় প্রশ্ন করল।

—কিছু না।

—উঁহু, কিছু একটা তো ভাবছই।

—সত্যি, কিছু না। সমুদ্রের পাড়ে চুপচাপই বসে থাকতে হয়।

চোখ কুঁচকে জয়া তাকাল আমার দিকে,—শরীর টরীর খারাপ হয় নি তো? বলেই কপালে হাত ছুঁইয়েছে,—সমুদ্রে আজ নেমেই উঠে এলে....ভাত খেলে ওইটুকুন....কোনও অস্বস্তি টস্বস্তি হচ্ছে?

মায়া মাখা স্বর। একটুতেই বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে জয়া। জোর করে হেসে উঠলাম, —আরে না না, আমি হানড্রেড পারসেন্ট ফিট। ....তারপর তোমাদের মন্দির ভ্রমণ কেমন হল?

জয়া সামান্য ঠোঁট ফোলাল,—এতক্ষণে মনে পড়ল? তোমার মতো নাস্তিক বাপু আমি জীবনে দেখিনি।

—শুধু কি নাস্তিক? বলো, পাষণ্ড নাস্তিক। ....তারপর, কত টাকা গচ্ছা দিলে পুজোয়?

—বেশি না, পঁচিশ টাকা।

—জগন্নাথ দর্শন হল?

—একদম কাছ থেকে দেখেছি। শুভ্রদা একটা পাণ্ডাকে ফিট করে ফেলেছিল, সে একেবারে....

—তবে আর কী! তোমার পুণ্য এখন খায় কে!

—ঠাট্টা করছ?

—উঁহু, হিংসে হচ্ছে। সামনে থেকে জগন্নাথ দেখা, এ তো এক বিরল সৌভাগ্য। গর্বও হচ্ছে, কত বড় এক পুণ্যবতীর স্বামী আমি....

—অ্যাই, টিজ করবে না।

নিজের আকস্মিক প্রগল্‌ভতায় নিজেরই অবাক লাগছে। বেশি উচ্ছলতা দেখে জয়া আবার কিছু সন্দেহ না করে বসে!

তবু উচ্ছ্বাসটাকে ধরে রেখেই বললাম,—জগন্নাথবাবুর সঙ্গে ফেস্ টু ফেস্ দেখা হয়ে গেল, কিছু বর টর চাও নি?

—চেয়েছি তো। বললাম আমার রামগরুড় স্বামীটাকে একটু হাসিখুশি করে দাও।

—কী বলল জগা? হাত তুলল, তথাস্তু? ওহো, জগন্নাথের তো আবার হাত নেই। পুওর ফেলো।

জয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল,—ঠাকুর দেবতা নিয়ে মস্করা? দেখবে দেখবে....

শুভ্র পাশ থেকে বলে উঠল,—অ্যাই, তখন থেকে তোরা কী গুজগুজ করছিস বল্ তো? প্রেম করতে হলে ও পাশে যা, মিত্রা পুলুদের ওদিকে।

—ইস্, প্রেমের কথা বলবে আপনার বন্ধু? তাহলেই হয়েছে।

—তাহলে কি জিওমেট্রির এক্সট্রা বোঝাচ্ছে?

জয়া আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

শুভ্র হৈ হৈ করে উঠল,—এই তো, এতক্ষণ পর জমেছে! সারাক্ষণ কেউ চুপচাপ, কেউ গুজগুজ, ভাল লাগে? ....এই জয়া, একটা গান ধরো তো।

জয়া হাসতে হাসতে হোঁচট খেল,—গান? এখন? এখানে?

—হ্যাঁআ। আমরা শুনব। তোমার বর শুনবে। সমুদ্র শুনবে।

পলকের জন্য মনে পড়ল এই শুভ্র সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে বন্দনাকে। আমার সঙ্গে সন্দেহ করে।

তেতো গলায় বললাম,—গাও না। শুভ্র যখন বলছে। চুপ করে বসে থাকতে আর ভালও লাগছে না।

বন্দনা চকিতে মুখ তুলল হাঁটু থেকে। এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার মুখ নামিয়েছে।

শুভ্র বলল,—আমি বলছিলাম বলে তো দর বাড়াচ্ছিলে। এবার বর বলছে, গাও।

—তুৎ, কোনও ভাল গান মনে আসছে না।

—ওরকমই হয়। সমুদ্রের ভাস্টনেসের সামনে সব গুলিয়ে যায়।

মধু চেঁচিয়ে উঠল,—আমি গাইব?

টুটুল হাততালি দিয়ে উঠল,—তুমি গানও গাইতে পার মধুকাকা?

—মধু যে কী না পারে! শুভ্র হা হা হাসল,—খেলতে পারে, হাসতে পারে, চপল সুরে গাইতে পারে.... কী গান গাইবি রে?

মধু গা মুচড়োল,—হাম তুম এক কামরেমে বন্ধ হো গাইব?

—শালা, চতুর্দিক হু হু করে খোলা, সামনে এত বড় একটা সমুদ্র দাপাচ্ছে, আর তোর কিনা এই গানটা মনে এল? মারব পাছায় তিন লাথ....

—তাহলে জিস্‌কি বিবি মোটি গাই?

—শালা, মোটা বিবি পেলেও তুই বর্তে যেতিস রে। অন্য গান ভাব্।

পুলু দূর থেকে স্বর পাঠাল,—অ্যাই, পাগলটাকে সাঁকো নাড়াতে বলিস্ না। জয়াই গাক।

বন্দনা আবার মুখ তুলেছে। ঘাড়টা হেলাল সামান্য। নরম স্বরে বলল,—গা না জয়া।

—একটা পুরনো গান গাই? জয়া নড়ে বসল।

—পুরনো গানই তো ভাল। গা।

গুনগুন করে গানটাকে একটু ভেঁজে নিল জয়া। তারপর খোলা গলায় গাইতে শুরু করল,—এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু/একটি সে নাম আমি লিখেছিনু/আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে তারে যেন মুছিয়া দিলাম....

মিত্রা পুলু গুটি গুটি এসে বসল কাছে। জয়া গায় ভাল, এখনও সময় পেলে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে। আজ, এই মুহূর্তে ওর স্বরটা যেন অন্য রকম লাগছিল। কোথ্থেকে যেন এক চাপা বিষাদ এসে ভর করেছে ওর গলায়, সমুদ্রকেও যেন থমকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এই জয়াই না একটু আগে খিলখিল হাসছিল? কোন্টা সত্যি? ওই হাসি, না এই বিষণ্ণতা?

বন্দনা আবার মাথা নীচু করে বসে। গান শেষ করে আবার একটা গান ধরেছে জয়া, শেষ করে আবার একটা। মিত্রা গলা মেলাল জয়ার সঙ্গে, পুলুও। কোরাসে গাইছে সকলে, মাঝখানে নাচছে টুটুল।

চাঁদ উঠল। মায়াবী চাঁদ। সমুদ্রে এখন সোনালি জ্যোৎস্না।

একা একা শুভ্র

শালা, কিছুতেই আমি মাতাল হতে পারি না! যত ভাবি নেশায় চুরচুর হয়ে যাব, নেশা শালা তত আমাকে বুড়ো আঙুল দেখায়! লোকে বলে মদ খেয়ে নাকি দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকা যায়! বকোয়াস, বকোয়াস, অল বকোয়াস। দেওদাসটা শালা পুরো ঢপ কেস ছিল। এই তো আমিই তিন চার পেগ টানার পরেও দিব্যি সজ্ঞানে বসে আছি! কোথায় নেশা? কোথায় নেশা? অ্যাই নেশা, তুই কোথায় রে?

আমি রোজ রোজ মাল খাই না। রেস্ত কোথায় অত, তাহলে তো ব্যাঙ্কের ক্যাশটা ভাঙতে হয়। ভালও লাগে না তেমন। ওই বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে মাঝেমধ্যে খেলাম, ব্যস্। তবে হ্যাঁ, যখন খাই তখন চুটিয়ে খাই। যাকে বল্রে দিল খোল্‌কে। ওই অন্তুটার মতো খুচখুচ একটু খেলাম, পৌনে এক পেগ, ওটা আমার ধাতে নেই। কিন্তু আমার ব্রেনের কেসটা বেশ গড়বড়ে আছে। খেয়ে কোথায় ঝিম মারব, টলমল করব, তা নয়, ব্রেনসেলগুলো যেন আরও টনকো হয়ে ওঠে। কত কিছু যে স্পষ্ট হয়ে যায় তখন! ঘূণাক্ষরেও যা স্মৃতিতে নেই, তাও। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত?

বন্দনা মাল খাওয়া একদম পছন্দ করে না। ওর বাপটা, মানে আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর টানুস টুনুস একটু বেশি করতেন বলেই বোধহয় ওই বস্তুটির ওপর ওর তীব্র অনীহা। খেয়ে শাশুড়িকে পেটাতেন কি? হতেও পারে। ওই বজ্জাত মেয়েছেলেটাকে দু' চার ঘা দেওয়াই উচিত। সজ্ঞানে না হলেও, অজ্ঞানে। শালী আমার বিয়েটাই কাঁচিয়ে দিচ্ছিল!

ওই মায়েরই যে মেয়ে বন্দনা তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। জিদ্দি, বেশি নীতিবাগীশ, দেমাকি....। কী সিন্‌টাই না করেছিল দার্জিলিঙে! অফিসের বন্ধুরা দশ পনেরো জন মিলে গেছি, এক দিনও কি আমোদ ফুর্তি করে বেচাল হতে নেই? জানুয়ারির ঠাণ্ডায় পাহাড়ে একটু উষ্ণ পানীয় লাগবে না? গোটা রাত বিছানাতেই এল না বন্দনা, ওই কনকনে শীতে ঠায় ব্যালকনিতে বসে রইল! কী, না আই হেট ড্রাঙ্কার্ডস্! অন্তুর ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে কী ইনসাল্টটাই না করল! ক' পেগই বা খেয়েছি, বড় জোর দুই কি তিন, তাতেই নবাবনন্দিনীর কী মেজাজ! সকলের সামনে! গটগট করে অন্তুর বাড়ি থেকে স্ট্রেট বাপের বাড়ি চলে গেল। আজকাল চোদ্দ বছরের ছেলেরাও মাল খেয়ে উল্টে পড়ে থাকছে, আর আমি একজন ম্যারেড ম্যান উইথ অ্যাকটিভ হ্যাবিটস, আমি একটু সুরা

পান করব না? বেশ করব খাব। বন্দনা যা যা ডিসলাইক করে সবগুলোই করব। বন্দনা করে না? কত বার বারণ করেছি, হুটহাট বাপের বাড়ি ছুটবে না, কথা শোনে বন্দনা? যে শ্বশুর শাশুড়ি দায়ে পড়ে ঢেঁকি গিলেছিল, যারা এখনও জামাইকে মন থেকে মেনে নিতে পারে নি, জামাই গেলে মৌনী বাবা মৌনী মা হয়ে যায়, কিম্বা ড্যাবড্যাব করে অনন্ত টিভি গিলতে থাকে, জামাইকে আদর করে দুটো কথা বলার ফুরসৎ পায় না, তাদের কাছে সপ্তাহে তিন বার করে ছোটা কি শুভ্র ব্যানার্জিকে ইনসাল্ট করা নয়? কী সব অজুহাত! বাবা একটু কেশেছিল যে! মা হেঁচেছিল যে! নেকু। শুভ্র জ্বরে পড়ে ভুল বকলেও অফিস কামাই করে বন্দনা? কী এত মধু অফিসে, অ্যাঁ? চাকরি তো করিস গভর্নমেন্টে, একদিন না গেলে সরকার কি উল্টে যাবে?

কান্না পাচ্ছে হঠাৎ। বন্দনা এমন পাল্টে গেল কেন? বাচ্চা কাচ্চা না হওয়ার জন্য? ডাক্তার তো বাবা দুজনেই দেখিয়েছি! নিজের কানে শুনেছে ডাক্তার বলেছে আমার কোনও দোষ নেই! বরং যেটুকু প্রবলেম, বন্দনারই। ট্রিটমেন্ট করালে ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে? দেয়ার মাস্ট বি সাম থার্ড ম্যান! ব্যাঙ্কের এক পেটি ক্যাশিয়ারে বন্দনা আর হ্যাপি নয়, ওর চোখ আরও উঁচুতে কোথাও।

হাহ্, এখন তো এসব ভাবনা আসতেই পারে বন্দনার। এই শুভ্র ব্যানার্জি কার জন্য নিজের কেরিয়ারকে দু' হাতে পিষে ফেলেছিল, তা বন্দনার মনে রাখার কী দায়! হয়তো এখন হাওড়ার সেই কাপড়ের দোকানদারের ছেলেটার জন্য মনে মনে আপশোস করে। বন্দনার অত রূপ বোধহয় ওই বাতাসী মঞ্জিলেই মানাত।

থার্ড ম্যানটা আর কে হতে পারে? অন্তু? ওকে বন্দনা সিডিউস করার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সুবিধে হবে না। অন্তু ইজ আ টাফ গাই। কী ন্যাকার ন্যাকাটাই না হয়েছে বন্দনা! জলকে আমার ভয় করে বলেই অন্তুকে জড়িয়ে নাচতে নাচতে সমুদ্রে নেমে গেল! মুখে তখন হাজার বাতির আলো। ইয়া এক ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল অন্তু বন্দনার মাথায়, অন্তুকে জড়িয়ে ধরার জন্য বন্দনার তখন কী নির্লজ্জ আকুতি। হুঁ হুঁ বাবা, এই জন্য অন্তু বাড়িতে এলে মহারানি এত খুশি খুশি হয়ে ওঠেন! ওরে, অন্তু তোকে পাত্তা দেবে না। খুব শিক্ষা দিয়েছে আজ অন্তু, জলেই নামে নি। তাই কি মহারানি গুম আজ?

গেল কোথায় মেয়েরা? মার্কেটিং? আসে না কেন এখনও? মধুকে যখন সঙ্গে নিয়ে গেছে, তাইই হবে। প্যাকেট ট্যাকেট বয়ে আনার একটা লোক চাই তো।

—কী রে, গ্লাসটা শেষ কর। এমন ব্যোম মেরে গেলি কেন?

খিকখিক হাসলাম,—আমি এখন ব্যোমে আছি।

—শালা, তুই আউট হয়ে গেছিস।

—নট অ্যাট অল। ভাংরা নেচে দেখাব? কিম্বা বল ড্যান্স? স্টেডি পা পড়বে।

অন্তু বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছে, হাতে সিগারেট। ঠাণ্ডা গলায় বলল,—থাক, কেরামতি দেখাতে হবে না। তাড়াতাড়ি গ্লাস শেষ কর, জয়ারা ফিরলে ডিনারে যাব।

—এত তাড়াতাড়ি তো শেষ হবে না চাঁদু। চোখ টিপলাম,—বাকি বোতলটার তাহলে কী হবে, অ্যাঁ?

—আর বোতল কোথ্থেকে আসবে? অন্তুর চোখে অবিমিশ্র বিস্ময়।

—আছে আছে। বলতে বলতে উঠলাম আমি। হোটেলের বেঁটে দেরাজ থেকে ওল্ড মংকের বড় বোতলটা বার করে আনলাম। অন্তুর নাকের সামনে নাড়িয়ে বললাম,—দিস ইজ দা থিং।

পুলু প্রায় আঁতকে উঠেছে,—এই শুভ্র, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হুইস্কির পর রাম!

—একটু রাম নাম ছাড়া জমে? খেতে খেতে কেত্তন গাইব....

অন্তু কড়া চোখে তাকাল,—কিনলি কখন রে ওটা? সারাক্ষণ তো তুই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলি!

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বোতল টেবিলে রেখে সিগারেট ধরালাম,—হোটেলের বেয়ারাগুলো আছে কী করতে!

পুলু হেসে ফেলল,—পারিসও বটে।

গ্লাসের তলানিটুকু ঢেলে দিলাম গলায়। সোনালি পানীয় তরল আগুন হয়ে প্রবেশ করছে ভেতরে, স্নায়ু আরও টান টান হল। অন্তু কেন জলে নামল না আজ? বন্দনাকে এড়াতে চাইছে? অন্তু যদি সে লোকটা না হয় তাহলে হু ইজ দা থার্ড ম্যান? দীপু খুব ঘন ঘন আসছে বাড়িতে, সে ব্যাটা নয় তো? সাত জন্মে কোনও সম্পর্ক ছিল না, শিলিগুড়ি থেকে বদলি হয়ে এসেই তোর মামাতো দাদার ওপর এত ভালবাসা উথলে উঠল? ব্যাটা চাকরিটাও করে জব্বর, হাজার বিশেক তো পায়ই। আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে অবলীলায় একটা দামী কাঁথাস্টিচ প্রেজেন্ট করল বন্দনাকে। কী মুগ্ধ চোখে বন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে!

দরজায় শব্দ।

পুলু উঠে ছিটকিনি খুলে দিল। মিত্রা বন্দনা ঢুকেছে ঘরে, পিছনে মধু।

মিত্রা জোরে জোরে নাক টানল,—বাপস্ কী গন্ধ ঘরে! তোমরা শুরু করে দিয়েছ?

—শুরু কী গো! আমরা এখন মাঝদরিয়ায়।

—ওমা, কী মজা! মিত্রার চোখ পড়েছে সেন্টার টেবিলের বড় বোতলটায়,—এই শুভ্রদা, আমরাও একটু খাব।

বন্দনার কপালে বাষট্টিটা বিরক্তির ভাঁজ। গোমড়া গলায় বলল,—আমি ও সবের মধ্যে নেই।

ন্যাকামো। স্বামীর বন্ধুদের সামনে সতীপনার ভিডিও ক্যাসেট চালাচ্ছে আবার। কাল রাতে আরেকটু দাওয়াই দেওয়া উচিত ছিল।

বন্দনাকে তাতানোর জন্য হা-হা হাসলাম,—নিশ্চয়ই খাবে। তোমাদের জন্যই তো এখনও বোতলটা খুলি নি।

মধুময়ের হাতে যা ভেবেছিলাম তাই, ইয়া ইয়া দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ। জানি ওটা উপুড় করলে কী কী বেরোবে। মোষের শিঙের শোপিস, হরিণের চামড়ার চটি, কট্‌কি শাড়ি, বাগায়রা বাগয়রা। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়েকে আমি পুরী এসে এ সব না কিনে ফিরতে দেখিনি। আজই কি আর মার্কেটিং শেষ! কাল আছে, পরশু আছে....

অন্তু জিজ্ঞাসা করল,—জয়া কোথায়? রুমে গেল?

—না, ডাইনিং হলে। টুটুল ঢুলছিল খুব। ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাবে।

মিত্রা বোতলটা হাতে তুলে লেবেল দেখছে। ভুরু বেঁকিয়ে বলল,—এটা কিন্তু খুব কড়া। আমি জানি।

বন্দনা বাঁকা সুরে বলল,—তুই তো অনেক কিছুই জানিস রে মিত্রা!

—না জানার কী আছে! আমি তো কত বার টেস্ট করেছি। জামাইবাবুরা খাইয়েছে, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে খেয়েছি....

—ভাল লাগে ওসব?

—মন্দ কী! কী দারুণ একটা ঘোর আসে, আলোগুলো আবছা আবছা লাগে, পা যেখানে ফেলতে চাইছি সেখানে পড়ছে না....কী মজা যে লাগে! তুই খাস নি কোনওদিন?

বন্দনার মুখ আরও থমথমে। উত্তর না দিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলল,—এত সব কি আগে থেকেই কেনা ছিল?

মধু তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আমি আনি নি। বিশ্বাস করো।

—কে বলেছে আপনি এনেছেন? বন্দনা খেঁকিয়ে উঠল,—সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেন কেন?

মধু আরও সিঁটিয়ে গেল। বেচারা মেয়েদের ভীষণ ভয় পায়। জানে, ওর কপালে কোনও মেয়ে জুটবে না কোনওদিন। তার জন্য মধুর কি কষ্ট আছে? ওরে মধু, তুই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। তুই ভাবতে পারিস কম, এ এক ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

পুলু বলল,—তাহলে আর দেরি করে লাভ কি? বোতলটা খুলে ফেলি? ....নাকি জয়ার জন্য একটুখানি ওয়েট করব?

অন্তু বলল,—জয়া কি রাম খাবে? বিয়ার হলে একটু টেস্ট ফেস্ট করত।

—আপনি তো খাবেন, তাই না? বন্দনা ঝট করে অন্তুর দিকে তাকিয়েছে। গলায় শ্লেষ।

অন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল,—খাই একটু। এক যাত্রায় পৃথক ফল হলে আড্ডার সুর কেটে যায়। ....তুমিও আজ একটু টেস্ট করে দ্যাখো না। বি স্পোর্টিং।

আশ্চর্য, বন্দনা ফেটে পড়ল না, বরং জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো শান্ত হয়ে গেল সহসা। শুকনো হেসে বলল,—বেশ তো, খাব। মাতলামি করাকেই যদি আনন্দ বলা হয়, তবে নয় মাতালই হব।

রাগ দেখাচ্ছে বন্দনা? অভিমান? নাকি এ আমাকেই কটাক্ষ? কবে আমি মাতলামি করেছি, অ্যাঁ?

পুলু বোতল খুলে ফেলেছে। গ্লাসে গ্লাসে ঢালছে কালচে সুরা। মধুর হাতে জলের জগ, পর পর গ্লাসে জল মিশিয়ে দিল। কুণ্ঠিত মুখে।

বন্দনা জল টল মেশাল না। হাতের ইশারায় বারণ করল। সত্যি সত্যি নিট খাবে নাকি? সহ্য করতে পারবে না যে! বাধা দেব? তাহলে যদি উল্টো....?

দরজায় আবার গুমগুম শব্দ। জয়া এল কি? হ্যাঁ, জয়াই। সরল চোখে ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে সবার দিকে।

আহা, মেয়েটা ঢুকতেই গোটা ঘর যেন বদলে গেল। কী টলটলে চোখ মেয়েটার! কী একটা গান আছে না, চোখই মনের আয়না, না কী যেন? গায়ের রঙ সামান্য চাপা বটে, তবু ওই শ্যামলা রঙেই ওকে মানায় বেশি। বন্দনার মতো

উদ্ধত দুর্বিনীত রূপ নেই জয়ার। জয়া যেন স্নিগ্ধ চাঁদের মায়া।

একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলাম জয়ার দিকে,—চলবে?

জয়া ভীতু ভীতু লাজুক লাজুক চোখে অন্তুর দিকে তাকাল,—ভাত খেয়ে এসেছি, এখন এ সব....?

—একটা সিপ দাও।

অন্তু দায়িত্বশীল স্বামীর মতো বলল,—ওকে আলাদা দিতে হবে না। আমার থেকেই চুমুক দিয়ে নেবে।

বন্দনা টেরচা চোখে এক মুহূর্ত দেখল অন্তুকে। পরমুহূর্তে এক ঢোঁকে গ্লাস শেষ। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে বন্দনার, জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। আবার গ্লাস বাড়িয়ে দিল পুলুর দিকে,—নেক্সট?

মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মস্তিষ্ক এখন স্বচ্ছ রাখা দরকার। মিত্রার দিকে চোখ পড়ল। মিথ্যে চালবাজি মারে নি, ভালই অভ্যেস আছে মনে হয়। চুকচুক চুমুক দিচ্ছে, পাকা নেশাড়ুর মতো। পুলু ভালই কমপ্যানিয়ান পেয়েছে, দ্যাবা দেবি গলা জড়াজড়ি করে দিব্যি মাল টানতে পারবে।

মধুর গ্লাসও শেষ। একটু পেটে পড়লেই মধু জোর চাঙা হয়ে ওঠে। চিরকালই। একবার কালী পুজোর প্যান্ডেলের পিছনে আমরা ভাঁড়ে ঢেলে হুইস্কি খাচ্ছি, কোথ্থেকে মধু এক কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি নিয়ে হাজির! ভাঁড়ে পাঁউরুটি ডুবোচ্ছে, কচকচ খাচ্ছে, আর হেঁড়ে গলায় শ্লোক আউড়ে চলেছে। সে যে কী উদ্ভট শ্লোক। না সংস্কৃত, না হিন্দি, না বাংলা, না ইংরিজি! হুইস্কি ভেজানো পাঁউরুটি শেষ করেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, মা মা, তারা কালী ব্রহ্মময়ী, বুকে পা দিয়ে চেপে ধর্, মা, বদরক্ত সব বেরিয়ে যাক! পাড়ার বাবা কাকারা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল, শেষ পর্যন্ত মাথায় এক বালতি জল ঢেলে শান্ত করতে হল ব্যাটাকে।

মধুর গুনগুন গান স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। উচ্চগ্রামে চড়ছে গলা। আপন মনে মাথা নাড়ছে মধু,—জুতায়ে করিব লম্বা, ঘুচে যাবে হম্বি তম্বা.... জুতায়েএ...এএএ....এএএ....

পুলু ফটাস একটা চাঁটি মারল,—অ্যাই, তোর গিটকিরি বন্ধ করবি?

জয়া মুখে আঁচল চেপে হাসছে,—কাকে জুতিয়ে লম্বা করবেন, মধুদা?

মধুর ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তার সুরে অটল। তার গলায় এখন ফৈয়াজ খাঁ থেকে ভীমসেন যোশী সবাই একের পর এক ভর করবেন। হোটেলের ম্যানেজার না

আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দেয়!

জয়া ব্যালকনিতে চলে গেল।

বন্দনা আবার পাত্র ভরেছে। চোয়ালে চোয়াল ঘষে চুমুক দিল। উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। ধপাস করে এসে বসেছে বিছানায়, প্রায় অন্তুর গা ঘেঁষে।

অন্তু সরে যাচ্ছে না কেন? স্মার্ট হাতে সিগারেট ধরাল অন্তু। রিঙ করছে ধোঁয়ার। আলগা ঘুরছে ফ্যান, হাওয়ায় ভেঙে যাচ্ছে বৃত্ত। এত কায়দা মারছে কেন অন্তু? নিজে স্টেডি আছে দেখাতে চায়? সব সময়ে বন্ধুদের থেকে এক কাঠি ওপরে থাকার ইচ্ছে? শালা, হিসেব করা খচ্চর। হি ইজ দা থার্ড ম্যান, আই বেট।

বন্দনা প্রায় ঢলে পড়েছে অন্তুর গায়ে। ওরে তোরা দ্যাখ, তোরা দ্যাখ!

আমার নিঃশ্বাসে কি আগুন? আমি কি অন্তুর কলার চেপে ধরব?

অন্তু বোধহয় টেলিপ্যাথি জানে, ঝড়াকসে উঠে দাঁড়িয়েছে। মেঝেয় থেবড়ে বসে পড়েছিল মধু, তাকে টেনে তুলল,—অ্যাই চল্, তোকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মধু হাউমাউ করে কেঁদে উঠল,—আমায় তোরা মার্, খুব মার্ অন্তু।

—কেন রে? তোর আবার কী হল?

—আমি একটা মাথামোটা। আমি তোদের যোগ্য নই। আমাকে তোরা মেরে ভাগিয়ে দে। লাথি মার্, লাথি মার্....

পুলু বলল,—শালা, এই জন্য ব্যাটার হাতে গ্লাস দিতে নেই।

মিত্রার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে পুলুর। শাড়িটার বেশ আলুথালু দশা।

পুলু মিত্রার গালে গাল ঘষল,—কি হে, তুমিও কি মাতাল হয়ে গেছ?

মিত্রা হি হি হেসে উঠল। হাসতে হাসতে এলোমেলো করে দিল পুলুর চুল।

জয়া ফিরেছে ঘরে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে সবাইকে। এতগুলো মাতালকে দেখে খুব মজা পাচ্ছে কি জয়া? ঘুরন্ত দৃষ্টি বন্দনায় এসে স্থির হল। মুচকি মুচকি হাসছে জয়া। মধুকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অন্তু, মধু এখন বিছানায়। যে মধুকে বন্দনা ঘোরতর অপছন্দ করে, সেই মধুর পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে বন্দনা!

পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। এ যে পুরো মিড সামার নাইটস্ ড্রিম! গাধার মাথাঅলা বটম ছুতোরের পাশে অকাতরে শুয়ে আছে মহামান্য জিউসের পত্নী!

মিত্রার হাসি থামছেই না। হেসে কুটিপাটি খাচ্ছে।

জয়া মিত্রাকে ধরে নাড়া দিল,—এই মিত্রা, থাম্ থাম্। হচ্ছেটা কী?

মিত্রা শিথিল হাত দোলাল,—কাণ্ডটা দ্যাখ! নিজে আউট হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করছে, হিহিহি....

পুলুর ঘাড় ঝুলে গেছে। কোনওক্রমে মাথা তোলার চেষ্টা করল,—মাইরি বলছি মিত্রা, তুমি আউট।

—না, তুমি আউট।

—না, তুমি। ....একদম ঝাপসা হয়ে গেছ। ....এই জয়া, আলোটা কী ডিম রে!

জয়া ওদের দুজনের কাঁধে হাত রাখল,—এই, তোরা ঘরে যা।

পুলু আর মিত্রা আবার হেসে পরস্পরের গায়ে পড়ে গেল।

মিত্রা নাকী সুরে বলল,—এঁই, তোমার খোঁমাটা এঁমন বেঁকে গেঁছে কেন? সোজা করে দেব? নাও, একটু খেলেই সোজা হয়ে যাবে।

অন্তু গম্ভীর স্বরে বলল,—পুলু, খাবি চল্।

—খাচ্ছি তো। দে, আরেকটু দে।

—না। আর একটুও নয়। চল্ আমার সঙ্গে।

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অনুতোষ এখন মাতাল সামলানোর ব্রতয় নেমেছেন! উত্তম।

অন্তু কটমট চোখে আমার দিকে তাকাল,—অ্যাই তুই, তুই হচ্ছিস পালের গোদা। কী দরকার ছিল....? আমি মধু পুলুদের ঘরে পাঠাচ্ছি, তুই বন্দনাকে দ্যাখ্।

—তুই বন্দনাকে দেখতে পারছিস না? কে যেন আমার মুখ দিয়ে বলে ফেলল, —তোরই তো ওকে দেখা উচিত।

অন্তু কি চমকাল একটু? বোঝা গেল না। আমারও দৃষ্টি ক্রমে ঘোলাটে হয়ে আসছে। সব কিছু কেমন অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া।

জয়া মিনতি করার ভঙ্গিতে বলল,—এই শুভ্রদা, প্লিজ। আপনি তো মোটামুটি ঠিক আছেন, এবার শেষ করুন না।

বোতলে সামান্য কালচে সুরা পড়ে আছে এখনও, বোতল থেকেই চলে গেল কণ্ঠনালীতে। দু হাত উল্টে দিয়ে বললাম,—ব্যস্, ফিনিশড্।

পুলু আর মিত্রা টালমাটাল পায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে। অন্তুর হাত মধুর কাঁধে, এক পা গিয়েই টলে গেল মধু, শক্ত হাতে অন্তু ধরে নিল তাকে। একা অন্তু সামলাতে পারছে না, হাত লাগিয়েছে জয়াও। মাথায় কিছু না থাকলেও

ঘাড়েগর্দানে মধু তো কম নয়।

অন্তুর বুক ফুলিয়ে প্রস্থান পছন্দ হচ্ছে না আমার। পিছন থেকেই তীর ছুঁড়লাম, —কিরে, কাটছিস যে? বন্দনাকে কে দেখবে?

অন্তু থামল, কিন্তু ঘাড় ঘোরাল না,—তুই দেখবি। ওঠ্, বিছানায় চলে যা।

—নো। তুই বন্দনাকে নিয়ে যা। ও তোর। ইওরস্, অ্যান্ড ইওরস্, অ্যান্ড ইওরস্।

অন্তু জয়ার দিকে তাকাল,—দেখেছ তো, শুভ্র নাকি আউট হয় না!

অন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হা ঈশ্বর, আবার জিতে গেল অনুতোষ! এই হট্টগোলের মধ্যেও ঠিক মাপ মতো পান করল, মাপ মতো কথা বলল, মাপ মতোই সামলাল সকলকে। আর শুভ্র ব্যানার্জি একটা বোকা সার্কাসের ক্লাউনের মতো উল্টোপাল্টা বকে বুরবক বনে গেল। শুভ্র, তুই আটার ফেলিওর।

শূন্য ঘর। নিষ্প্রভ আলো। স্তূপীকৃত গ্লাস বোতল। সোফায় প্লাস্টিক ব্যাগ। কার্পেটে বালিস। জগ উল্টে গিয়ে জল গড়াচ্ছে।

গড়াক, সব গড়িয়ে যাক। সংসারই যেখানে গড়াচ্ছে....

একটা গন্ধ নাকে ঝাপটা মারল। এই ঘর থেকেই আসছে কি? কিসের গন্ধ? হুইস্কির? রামের? নাকি পেচ্ছাপের? বাথরুমের দরজা হাট হয়ে আছে, বন্ধ করতেও ইচ্ছে করছে না। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিছানায় এলাম। বসেছি। বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে আছে বন্দনা, উপুড় হয়ে, হাত ছড়িয়ে, ঘাড় হেলিয়ে। বিছানার একেবারে মধ্যিখানে।

গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম,—এই যে, ওঠো, ঠিক হয়ে শোও।

বন্দনার বোজা চোখ খুলল না। টেনে টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল,—উঠব না। তুমি পাশে এসো। এসো না, প্লিজ।

কাকে খোঁজে বন্দনা? আমাকে, নাকি থার্ড ম্যানকে? ঝুঁকলাম সামান্য। বন্দনার পিঠে ভর রেখে। ওই তো সেই মুখ, টোলপড়া গাল, ওই তো কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট! সবই তো এক আছে বনো, তবে তুমি কেন বদলে গেলে? সন্দেহও তো ভালবাসাই, এটুকু বোঝ না?

কান্না পাচ্ছে আবার। মুচড়ে উঠল বুকটা। কোন্ এক অদৃশ্য বেহালাঅলা ছড় টানছে পাঁজরে। ওথেলোও তো কেঁদেছিল, না কি?

আরে যাহ্, আমি বোধহয় মাতালই হয়ে গেছি!

মিত্রার মন

বিছানায় রোদ পড়তেই ঘুমটা ছিঁড়ে গেল। চোখ খুলতে পারছি না, কে যেন ভারী পাথর বসিয়ে দিয়েছে পাতায়। মাথাটার কী হাল রে বাবা, এ যেন একেবারে দশ-মণি বোঝা! আমি কোথায়?

পিটপিট করে তাকালাম। আলো সওয়াচ্ছি চোখে। হ্যাঁ, এ তো আমাদেরই ঘর, ব্লু লেগুনের দুশো তিন। পাশে পল্লব, হাত পা ছড়িয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মুখটা কী বিশ্রী হাঁ হয়ে আছে পল্লবের। কটা বাজে এখন? সাতটা? আটটা? ঠেলে তুলে দেব পল্লবকে?

চোখ রগড়ে উঠে বসতেই মাথা ঝিমঝিম। কে যেন ডাঙশ মারছে মাথায়। বাথরুম আর ক' পা, এটুকু যেতেই কষ্ট হচ্ছে বেশ। শরীরের গাঁটে গাঁটে কী ভীষণ যন্ত্রণা! কাল কি খুব বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম? ছিলাম তো বন্দনাদের ঘরে, ফিরলাম কখন? ছি ছি, নির্ঘাৎ টোটাল আউট হয়ে গিয়েছিলাম! কী কী কাণ্ড করেছি কে জানে! অন্যরা কী অবস্থায় ছিল? পল্লব খুব হাসছিল, মধুদাও কী সব চেঁচাচ্ছিল, আর... আর...? দূর ছাই, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

বেড-টি কেন দিয়ে যায় নি আজ? নাকি এসেছিল, দরজায় ধাক্কা মেরে ফিরে গেছে? বাথরুম ঘুরে এসে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে চা দিতে বললাম। ডাকব পল্লবকে, যদি না ওঠে দু' কাপই মেরে দেব। তাতে যদি মাথাটা ছাড়ে!

ইস্, কী চেহারা হয়েছে মুখের! চোখ দুটো ফোলা ফোলা, কাজল ধেবড়ে আছে, সিঁদুর কপালে মাখামাখি, চুলের কথা তো অকহ্তব্য। কী জট রে বাবা, চিরুনি চালাতে মাথা টনটন করে উঠছে! নাহ্, কাল একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি। কেন যে অমন ফাঁট মারতে গেলাম? সত্যি সত্যি জীবনে কটা দিনই বা ড্রিঙ্ক করেছি আমি? বড় জামাইবাবুর বাড়িতে বার দুয়েক বিয়ার, মেরে কেটে এক গ্লাস করে, আর মেজ জামাইবাবুর গ্লাস থেকে একদিনই মাত্র হুইস্কিতে চুমুক, ব্যস্। না না, আরেক দিন সেই কলেজের পিকনিকে। সৌম্য অনীশ মালবিকা তনুশ্রী সবাই খাচ্ছিল, সেদিন বড় জোর এক পেগ। রাম আমি জন্মে ছুঁই নি। কী কড়া রে বাবা, একেবারে আছড়ে ফেলে দিয়েছে! খেতে কিন্তু তখন বেশ লাগছিল। মাথাটা হাল্কা হাল্কা, হাত পা ল্যাল ল্যাল করছে, মনে হচ্ছে যেন শূন্যে হাঁটছি আর গোঁত খাচ্ছি....। পল্লবকে আরেক দিন উসকোতে হবে, ফেরার আগের দিন। রাম না খাই, হুইস্কিই খাব, তাতে নিশ্চয়ই এত হ্যাঙওভার হবে না। হিহি, হ্যাঙওভার! আমার হ্যাঙওভার! শ্বশুর শাশুড়ি শুনলে মূর্ছা

যাবেন। ....বন্দনাটা না আবার ব্যাগড়া দেয়।

দাম্ভিক মেয়েটাকে বোঝা দায়। খাস না খাব না করেও চোঁ চোঁ অনেকটাই তো টানল! পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ, ও আমি অনেক দেখেছি!

ওফ্, পল্লবের কী নাক ডাকছে! এখনও। এমন তো ডাকে না সচরাচর, এও কি মদ্যপানের পার্শ্বক্রিয়া? পল্লবও বেশ জমিয়ে টানতে পারে। মিছিমিছি সেদিন দিদির ওখানে ঢঙ্ করে বলল, আমার ও সব অভ্যেস নেই!

শ্বশুরবাড়িতে এক অদ্ভুত মুখ করে থাকে পল্লব। যেন ভীষণ ভালমানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অ্যাক্টিং!

খাটে এসে আলগা ধাক্কা দিলাম পল্লবকে,—অ্যাই ওঠো, বেলা হয়ে গেছে।

পল্লবের নাক থামল। পাশ ফিরে শুয়েছে। একবার তাকিয়েই চোখ বুজে ফেলল,—ক'টা বাজে?

—সাড়ে ন'টা।

—সে কী, ডাকো নি কেন? পল্লব ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। জলহস্তীর মতো হাই তুলল কয়েকটা। সুখী বেড়ালের মতো আড়মোড়া ভাঙছে। আমাকে জড়িয়ে চকাস করে চুমু খেল,—ওরা উঠেছে?

—কী জানি! মনে হয় আমরাই ফার্স্ট।

পল্লব চোখ টিপল,—খুব হুল্লোড় হল কাল, কী বলো?

—সেই মস্তির ঠেলাই তো সব সামলাচ্ছে এখনও। কলেজের ভাষা বেরিয়ে গেল আবার। পল্লবের কাঁধে মাথা রাখলাম,—মাথা যা ধরে আছে না!

পল্লব শশব্যস্ত,—ওষুধ খাও নি কেন? ব্যাগে তো স্যারিডন ম্যারিডন আছে।

—আমার ওষুধ খেতে ভাল লাগে না।

পল্লবের চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে গেল,—মাথা টিপে দেব?

—থাক। তুমি কি আর মাথা টিপেই থামবে? ....কাজের কাজ করো, মুখ টুখ ধুয়ে নাও, রেডি হয়ে সমুদ্রে যাই চলো।

—যদি আজ স্নানে না যাই?

—তাহলে আমি একাই যাব। সমুদ্রে না নামলে শরীর ঠিক হবে না!

—তুমি বড্ড বেরসিক। বেজার মুখে উঠে পড়ল পল্লব। অলস পায়ে বাথরুমে ঢুকেছে।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলাম। সমুদ্রতীরে যথারীতি স্নানার্থীদের ভিড়। দুটো একদম গেঁড়ি গেঁড়ি বাচ্চা বালিতে

ছুটছে উদ্দাম, ধপাস করে পড়ে গেল, কাঁদল না, আবার উঠে ছুটছে। চড়া রোদ পড়ে সমুদ্র এখন নীল নয়, প্রায় বর্ণহীন। বহু বহু দূরে একটা কালো বিন্দু, ও কি কোনও জাহাজের মাস্তুল?

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলেই দু পা পিছিয়ে এলাম। মধুদা। পরনে সেই কিম্ভূতকিমাকার হাফপ্যান্ট, খালি গা, দু' হাতে দুটো ব্রেকফাস্টের প্লেট। এই পোশাকেই গোটা হোটেল ঘুরে বেড়াচ্ছে? লজ্জাশরমও নেই?

দাঁত বার করে হাসল মধুদা,—কী ঘুম ঘুমোচ্ছিলে গো? তোমাদের ব্রেকফাস্ট সেই কখন থেকে আমরা ঘরে রেখে দিয়েছি!

কিছু একটা বলতেই হয়। বললাম,—থ্যাংক ইউ।

—চা কিন্তু পাবে না। দু' বার চা এসে ফিরে গেছে।

চা পান যে হয়ে গেছে বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,—জয়ারা কোথায়?

—ঘরে। সকালে উঠে আমি জয়া টুটুল আর অন্তু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। অনেক দূর। যা ঝিনুক কুড়িয়েছি না, পুরো একটা দোকান হয়ে যাবে। বলতে বলতে হেঁ হেঁ হাসছে।

পলকের জন্য মনে পড়ে গেল রাতের দৃশ্যটা। উৎকট চেঁচাচ্ছিল মধুদা! মুখ দিয়ে তখন লালা ঝরছিল!

গা ঘিনঘিন করে উঠল। বললাম,—ঠিক আছে, আপনি ওগুলো রেখে চলে যান, আমরা আসছি।

মধুদা বিছানায় গিয়ে বসল। আচ্ছা বেহায়া তো, যেতে বললেও যায় না? ইতিউতি তাকাচ্ছে। পল্লবের চা রাখা আছে টেবিলে, দেখলও সেটা। তার পরও প্রশ্ন,—পুলু নেই? বেরিয়েছে বুঝি?

আমি নয়, পল্লবই বাথরুম থেকে উত্তর দিল,—হ্যাঁ রে, আমি একটু মন্দিরে গেছি।

—ও, তুই পায়খানায়?

অসহ্য। একে কি গলাধাক্কা দিয়ে বার করতে হবে? সেই বিশ্রী চাহনি, যেন চাটছে আমায়! লজ্জাও নেই, কাল অত বকুনি খেল....!

কটমট করে তাকালাম। পাত্তা না দিয়ে কামড় বসালাম টোস্টে। চিবোতে চিবোতে বিছানা টান করছি। তবু নড়ল না লোকটা, যেখানটা বসে আছে সেখানটা একটু ঝেড়ে পা গুটিয়ে বসল। এক গাল হেসে বলল,—তোমরা

দুজনেই কালকে একদম আউট হয়ে গেছিলে।

—তো?

—না, মানে শুধু তোমরা নও, জানো তো, বন্দনা পুরোপুরি ডাউন। সারারাত বমি টমি করে....এখন একেবারে নেতিয়ে পড়ে আছে।

—সে কী? কথা বলতে না চেয়েও বলে ফেললাম।

—হ্যাঁ গো, জীবনে তো কখনও খায় নি, একবারে ওভারভোজ হয়ে গেছে।

আমারও কেমন যেন মন বলছিল, কিছু একটা হবেই। বড় জামাইবাবু সব সময়ে বলে, মাল সইয়ে সইয়ে খেতে হয়। কাল যা ঢকঢক করে গিলছিল বন্দনা! নভিশদের বোধহয় এমনটাই হয়।

এক সঙ্গে এসেছি, চিন্তিত হওয়াটাই শোভন। গলা উঠিয়ে বললাম,—এই, তুমি তাড়াতাড়ি বেরোও। বন্দনার শরীর ভাল না, কী সব বমি টমি করেছে।

পল্লব তোয়ালে পরে বেরিয়ে এসেছে। গালভর্তি সাদা সাবান, হাতে রেজার। ট্যুরে এসেও পল্লব টিপটপ থাকে। অভ্যেস।

পল্লব কিছু প্রশ্ন করার আগেই চোখের ইশারায় বললাম, লোকটাকে তাড়াও।

ঠিক বুঝে গেছে পল্লব। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে স্থির করে নিল ইতিকর্তব্য। নীচু হয়ে চায়ের কাপে আঙুল ছোঁয়াল। নিপুণ অভিনেতার মতো বলে উঠল,—অ্যাহ্, এ তো একদম ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে রে।

মধুদা নির্বোধ চোখে তাকাল,—ও, তোরা চা পেয়েছিস?

—নয়তো এটা কী? ঘোলের শরবৎ? যা, এক কাপ আরও নিয়ে আয়। একদম গরম গরম, ধোঁয়া ওঠা।

গলায় আহ্লাদী ভাব ফোটালাম,—আমার জন্যও এক কাপ আনবেন মধুদা, প্লিজ।

লোকটা গলে গদগদ হয়ে চলে গেল। প্রায় লাফাতে লাফাতে।

পল্লব খ্যাকখ্যাক হাসল,—দেখলে তো, পাঁঠাটা সঙ্গে থাকলে কী লাভ? কত কাজে লাগে....! বাই দা বাই, তোমার কী পাকা ধানে মই দিচ্ছিল ব্যাটা?

—যা ঝাড়ি মারছিল! ওর সামনে থাকা যায় না।

—আরে বাবা, কত বার বলব, ওটা ঝাড়ি নয়। অ্যাবনরমাল। অ্যাবনরমাল লোকেদের দৃষ্টি কখনও নরমাল হয়?

—কীসের অ্যাবনরমাল বুঝি না বাপু। খাচ্ছে দাচ্ছে, বগল বাজাচ্ছে....

—সত্যিই ও সুন্দর বগল বাজায়। পল্লব মুখের কথা কেড়ে নিল,—যা ফাইন

একটা আওয়াজ করে না....

—তুমি থামবে?

পল্লব রণে ভঙ্গ দেওয়ার ভঙ্গিতে দু' হাত তুলে বাথরুমে চলে গেল। দরজা খোলা, দাড়ি কামাচ্ছে আয়নায়।

ওখান থেকেই বলল,—বন্দনার ব্যাপারটা কিছু বুঝলে?

—বোঝার কী আছে! অনভ্যাসের নেশা....

—অত সোজা কেস নয় ম্যাডাম। ....বন্দনা শুভ্রকে টাইট দিচ্ছে।

—বমি করে?

—ও সব পারে। লক্ষ্য করছ না, এখানে এসে অন্তর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করছে? ওটাও ইচ্ছে করে। শুভ্রটা একটু কমপ্লেক্সে ভোগে তো....

—কীসের কমপ্লেক্স? শুভ্রদারও যথেষ্ট হ্যাণ্ডসাম চেহারা।

—রাখো তোমার হ্যাণ্ডসাম। বন্দনার কাছে শুভ্র? মুখে আফটারশেভ লোশান থুপতে থুপতে ঘরে এল পল্লব। আয়নায় দাঁড়িয়ে দু'চার বার হাত বোলাল গালে। কপাত করে একটা ডিমসেদ্ধ তুলে মুখে পুরল। খেতে খেতে বলল, —বন্দনার কথা ছাড়ো। এক বেলা রেস্ট নিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

—তা হয়তো হবে। ....কাল না খেলেই পারত।

—হুঁ। পল্লব হঠাৎ চোখ টেরচা করল,—এই, তুমি আমায় একটা সত্যি কথা বলবে?

—কী?

—গুল মারবে না কিন্তু। ....তোমার কি বিয়ের আগে মাল খাওয়ার হ্যাবিট ছিল?

—এমা, না। মাইরি না। তোমায় ছুঁয়ে বলছি। কালই প্রথম....

কেন অনর্থক মিথ্যে বললাম? মিথ্যেই বা কোথায়, আধা সত্যি। এক দু'বার ছোঁয়াকে না ছোঁয়াই বলে।

হাল্‌কা মনে বললাম,—গা'টা কিন্তু এখনও ম্যাজ ম্যাজ করছে। কী করে হ্যাঙওভার কাটানো যায় বলো তো?

—দুটো উপায় আছে। পল্লব মুখ টিপে হাসল,—এক, আরেকটু নতুন করে খেয়ে নেওয়া। আর দ্বিতীয়টা একেবার মহৌষধ। সেটা অবশ্য মুখে বলার থেকে করে দেখানোই সোজা। পল্লব চোখ মারল,—দেখাব?

—কান্‌কি মেরো না। এত ক্ষিধে কেন, অ্যাঁ? কলা খাচ্ছ, তাই খাও না।

পল্লব বোধহয় আরও কিছু আদিরসাত্মক কথা বলতে যাচ্ছিল, ভেজানো দরজা ঠেলে আবার বোকা লোকটা ঘরে ঢুকেছে। সঙ্গে অন্তুদা, জয়া। টুটুলও আছে, পরনে মিষ্টি একটা লাল সুইমিং কসটিউম।

অন্তুদা গমগম করে হাসল,—কী, খোঁয়াড়ি কাটল?

হায় রে, সারাদিন এরা আমার পেছনে লাগবে? ঠোঁট উল্টে বললাম,—ইশ, নিজেরা একটুও না খেয়ে আমাদের খাইয়ে মজা দেখলেন, এখন আওয়াজ মারা হচ্ছে?

জয়া চোখ মুখ কুঁচকোল,—বাবাহ্, কী বিচ্ছিরি খেতে! এক চুমুক খেয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছিল।

—ওইটুকু খেলে অমনই লাগে। তুই তো আসল মজাটাই পেলি না। শরীর থেকে মনটা একদম আলাদা হয়ে যায়। মনে হয় আমি বুঝি আর আমাতে নেই।

—সেটা কী গো কাকিমা? টুটুল পুট করে বলে উঠল,—আমিও মজার জিনিস খাব।

—হ্যাঁ, ওটাই তোমার খাওয়া বাকি আছে তো! জয়ার লঘু ধমক।

অন্তুদা গম্ভীর মুখে বলল,—এবার টপিক পাল্টাও। ....চটপট তৈরি হয়ে নাও তো দেখি। এর পর জলে নামলে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।

পল্লব জিজ্ঞাসা করল,—শুভ্রদের কী হবে?

—ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। বন্দনা তো নিশ্চয়ই বেরোবে না। অন্তুদা জয়াকে বলল,—যাও তো, ওদের আরেক বার দেখে এসো।

জয়া টানল আমাকে,—চল্ তো!

শুভ্রদা দরজা খুলেছে। মুখ চোখ শুকনো, চোখের নীচে কালি।

হাসল, কিন্তু কষ্ট করে,—কী গো, সুন্দরী মেয়েরা? কী বা বারতা? কহো।

—বন্দনা এখন কেমন?

পর্দা সরিয়ে বন্দনাকে দেখিয়ে দিল শুভ্রদা। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বন্দনা, গায়ে একটা পাতলা চাদর।

জয়া জিজ্ঞাসা করল,—এখনও ঘুমোচ্ছে?

শুভ্রদা মাথা দোলাল,—ঘুমোচ্ছে, জাগছে, এখন বোধহয়....

—বমি হয়েছে আর?

—নাহ্। ওই সারা রাতই যা....

জয়া মুখ ঘুরিয়ে একবার আমায় দেখে নিল। তারপর চাপা স্বরে প্রশ্ন করল,

—আপনি সমুদ্রে যাবেন?

—গেলে মন্দ হয় না, শরীরটা একটু ছাড়ত। শুভ্রদা ঘাড়ে হাত বোলাল,—সেই কোন্ রাত থেকে জাগা....

—তো একটু ঘুমিয়ে নিন না। বন্দনার কাছেও থাকা হবে....আমার তো মনে হয় বন্দনাকে একা ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।

কী মেয়ে রে বাবা! বন্দনা অন্তুদা এখানে এসে যা করছে, যে কেউ দেখে বলবে ওদের মধ্যে একটা কিছু আছে! সেদিন জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য জয়া অত করে সাধল অন্তুদাকে, সবাই গেল, অন্তুদা কিছুতেই নড়ল না, আর বন্দনা তো আগে থেকেই.... জয়ার মনে কি একটুও খটকা লাগে নি? কেমন উদার বড়দি বড়দি ভাব করে কথা বলছে দ্যাখো! আমি হলে তো বাবা বন্দনার খবরই নিতাম না। জয়াটা বোকা বোকা বোকা, রামবোকা। মধুময় নন্দীর পরিশীলিত সংস্করণ।

মনে মনে স্থির করে ফেললাম, জয়াকে একটু জ্ঞান দিতে হবে। ওর একটু চোখ ফোটা দরকার।

জয়া ঘরে ঢুকতে সামান্য ইতস্তত করছে। শুভ্রদা বলল,—যাও না। ডেকে দ্যাখো ওঠে কিনা....পুলু অন্তুরা কোথায়?

—আমার ঘরে। আমিই উত্তর দিলাম এবার।

চোখ কুঁচকে এক সেকেণ্ড আমায় দেখল শুভ্রদা। অন্যমনস্ক মুখে ঘরে ফিরল একবার, সিগারেট দেশলাই নিয়ে আমাদের ঘরে চলে গেল।

কী ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছে শুভ্রদাকে। আহা রে, ওরকম একটা বউএর পাল্লায় পড়ে বেচারার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল!

জয়া বন্দনার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিও গেলাম।

বন্দনা যেন টের পেল আমাদের উপস্থিতি, সহসা চোখ মেলেছে। ফ্যাকাশে হাসল,—ও, তোরা?

জয়া বসল খাটে। বন্দনার চুলে হাত বুলিয়ে দিল,—কি রে, কী কষ্ট হচ্ছে এখন?

বন্দনার হাসি আরও ম্লান,—এখন বেটার।

জয়া কোমল স্বরে বলল,—কেন জেদ করে কাল অতটা খেতে গেলি? সকলের কি সব সহ্য হয়? দেখলি না, আমি মুখে একটু ছুঁইয়েই রেখে দিলাম?

বন্দনা নিশ্চুপ। দু' ফোঁটা জল জমেছে চোখের কোলে।

জয়ার স্নেহমাখা স্বরে যেন জাদু আছে। কোথ্থেকে যেন একটু একটু মায়া আমার বুকেও সংক্রামিত হচ্ছিল। ইশ্, কী চোখমুখ বসে গেছে মেয়েটার! ফিকে গোলাপি রঙ ফ্যাটফ্যাট করছে, অ্যানিমিক রুগীর মতো।

মৃদু গলায় বললাম,—ওষুধ টষুধ খেয়েছিস কিছু? বমির জন্য?

—না।

—মধুদাকে দিয়ে আনাব?

—লাগবে না রে। আর একটু রেস্ট নিলেই ফিট হয়ে যাব।

—খাস নি তো কিছু নিশ্চয়ই? একটু শরবৎ টরবৎ করে দিতে বলব হোটেলে?

—না রে।

—কোল্ড ড্রিঙ্কস্ আনাব, খাবি?

—না রে। বন্দনা নাক কুঁচকোল,—ভাল্লাগছে না।

—কিছু না খেলে আরও কাহিল হয়ে পড়বি কিন্তু।

—বললাম না, ভাল্লাগছে না!

জয়া চোখ পাকিয়ে তাকাল,—অ্যাই মেয়ে, কী তখন থেকে ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না করছিস? ....মিত্রা যা তো, অন্তুকে একবার ডেকে আন তো। ও না ধমকালে এ বেটি সিধে হবে না।

প্রায় স্তম্ভিত হয়েই ঘরে চলে এলাম আমি। মুখের কথা খসাতেই অন্তুদা আর পল্লব হন্তদন্ত হয়ে ও ঘরে গেল। শুভ্রদা শুয়ে আছে আমাদের বিছানায়, চোখ বুজে। নড়ল না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল আমার। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, —টুটুল মধুদা গেল কোথায়?

শুভ্রদা তাকাল,—মধু টুটুলকে নিয়ে জলে নেমে গেছে। টুটুলের আর তর সইছিল না।

—এমা, একা মধুদার সঙ্গে ছেড়ে দিলেন?

—তো কী আছে? মধু খুব ভাল সাঁতার জানে।

—সমুদ্রে সাঁতার জানা তেমন কাজে লাগে না। টুটুল কোথায় কোন দিকে ছুটবে, মধুদা ভুসো মক্কার মতো তাকিয়ে থাকবে....

—সে চান্স নেই। মধুকে ডিউটি অ্যালট করলে কদাচ ফাঁকি মারে না। টুটুলের হাত মধু ছাড়বেই না।

তবু আমার ভাল লাগল না। আর একজন কারুর অবশ্যই সঙ্গে যাওয়া

উচিত ছিল। ব্যালকনিতে গিয়ে চোখ রাখলাম পাড়ে। ভিড় এখন বেড়ে গেছে খুব। এক জায়গায় অনেকটা নেমে গেছে বালিয়াড়ি, ওখানে কেউ থাকলে এখান থেকে দেখতে পাওয়া মুশকিল। যাক গে যাক, অন্তুদার মেয়ে, অন্তুদারই যখন মাথাব্যথা নেই....

শুভ্রদা কী যেন বলছে ঘর থেকে।

ফিরলাম ঘরে,—ডাকছেন, শুভ্রদা?

—ভাবছি আর স্নানে যাব না। তোমরাই চলে যাও। আমার এখন শুয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

—বেশ তো, থাকুন না। ভাল করে ঘুমিয়ে নিন, বিকেলে একদম ঝরঝরে হয়ে বেরোবেন।

—ঘুম আর আসবে না। শুয়ে থাকাটুকুনই আরাম। বিশেষ করে তোমাদের এই বিছানাটায়।

—ওমা, সে কী কথা! কেন? কী এমন মহৎ গুণ আছে এই খাটের?

—আছে একটা গুণ। সুন্দর সুখী কাপ্‌লের গন্ধ লেগে আছে।

—যাহ্‌, কী যে বলেন না! হঠাৎ বুকে রক্ত চল্‌কে উঠল আমার। অস্ফুটে বললাম, —পৃথিবীতে সব কাপল্‌ই সুখী, সব কাপল্‌ই অসুখী। সুখ অসুখ খুব রিলেটিভ ব্যাপার শুভ্রদা। আপনি যদি আপনাকে দুঃখী ভাবতে চান, তাহলে আপনি দুঃখী। আবার সুখী ভাবতে চাইলে সুখী।

—কী বলে রে মেয়েটা? পুলু যদি একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে ভেগে যায়, তাহলেও তুমি একই কথা বলবে?

বাস্তবে কী ঘটলে কী করব বলা কঠিন। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললাম, —পল্লবের যদি আমাকে পছন্দ না হয়, যদি না বনে, অন্য কোথাও যেতেই পারে। তা বলে আমি হাপুস নয়নে কাঁদতে বসব কেন? আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। মনে করব যা ঘটার ছিল, তাই ঘটেছে।

—তুমি যে স্টোয়িক ফিলজফি আওড়াচ্ছ হে? বি এ-তে ফিলজফি কম্বিনেশান ছিল বুঝি?

হাসলাম,—বই পড়ে দর্শন আসে না শুভ্রদা। জীবন থেকেই আসে।

—হবে হয়তো। তবে দর্শনের কচকচিতে না গিয়ে বলতে পারি তোমাদের বিছানায় শুয়ে মনে হচ্ছে, এখানে হয়তো বহুদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। অফকোর্স তোমার যদি আপত্তি না থাকে!

—ছি ছি, এ কী কথা। থাকুন না শুয়ে, আমি তো এখন সমুদ্রেই চলে যাব।

কথাটা বললাম বটে, তবু বুকটা কেমন যেন টিপটিপ করে উঠল। কেন উঠল কে জানে! মায়া? করুণা? অন্য আর কী হবে?

সালোয়ার কামিজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। কাল রাতের শাড়িটাই পড়ে আছি এখনও, একেবারে ক্রাশড্ হয়ে গেছে। ড্রিঙ্কস্ ট্রিঙ্কসও পড়েছে, সাবানে ভিজিয়ে দেব? থাক গে, কলকাতায় গিয়ে লন্ড্রীতেই দিয়ে দেওয়া যাবে। স্নান সেরে ফিরে এ শাড়ি থোপাথুপির জোস থাকবে না। পল্লবকেও হুকুম করাটা ইনহিউম্যান হবে।

পোশাক বদলে তোয়ালে কাঁধে বেরয়েহ দেখি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে শুভ্রদা। নিখাদ ঘুম। সমলয়ে নিশ্বাস পড়ছে।

বন্দনাকে দেখার অনেক লোক আছে, কিন্তু এই মানুষটাকে কে দেখে? একটু হাত বুলিয়ে দেব শুভ্রদার মাথায়?

চিন্তাটায় কি পাপ আছে কোনও? নাহলে কেন এগোতে পারছি না?

কোনার্ক ও মধুময় : এক

ট্যুরিস্ট বাসে পর পর সিট পাওয়া গেছে। সামনে মিত্রা পুলু, মাঝে অন্তু টুটুল জয়া, তারপর শুভ্র বন্দনা, শেষে আমি। এমনটাই হয়, বেড়াতে বেরোলে সব চেয়ে ওঁচা জায়গাটা আমার জন্যই বরাদ্দ থাকে। এর ব্যত্যয় ঘটলেই আমি অবাক হই।

তবে এই সিটটার একটা অন্তত প্লাস পয়েন্ট আছে। জানলা পাওয়া গেছে। এটুকুও না'ও জুটতে পারত।

আমার পাশে এক মাঝবয়সী লোক। শিক্ষিত চেহারা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, পোশাক আশাকেও বেশ আভিজাত্য আছে। একটাই দোষ। ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছে লোকটা, ছিটে ওড়াচ্ছে। বাপস্ কী ঝাঁঝ, এক্ষুনি আমার একটা হাঁচি হবে।

হলও। একটা নয়, চলল পর পর কয়েকটা। মাথার ঘিলু চলকে গেল।

শুভ্র সিটের ফাঁক দিয়ে ঘুরে তাকিয়েছে,—এই গাড়োল, হচ্ছেটা কী? ভদ্রলোকেদের সঙ্গে যাচ্ছিস, সভ্য-ভব্যের মতো হাঁচ্। নিদেনপক্ষে একটা রুমাল চাপ্ নাকে।

ঝকঝকে সকালটা বিস্বাদ হয়ে গেল। বন্ধুরা কি চিরকাল আমার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলবে? আমি অভব্য গাড়োল, আর যে লোকটা সবার অসুবিধে করে নাকে নেশা ঠুসছে সে হল ভদ্রলোক?

জোর করে হাসি ফোটালাম,—হেহ্, আমার কাছে রুমাল! ল্যাঙোটের আবার বুকপকেট!

বন্দনা কটমট তাকাল। শব্দগুলো কি ওর কানের পর্দায় বিঁধল? আহা, মধুময় যেন জানে না শুভ্র তোমার ওপর চোটপাট করার সময়ে কী ভাষা ব্যবহার করে!

হাতের পিঠে নাক মুছে বাইরে চোখ মেললাম। হু হু হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। পথের ধারে লাইন দিয়ে এক ধরণের গাছ। কাজু না? দিঘায় অন্তু আমায় দেখিয়েছিল? আজ আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ, কাজুবনে কী সুন্দর হাল্কা ছায়া! এই রাস্তার নাম মেরিন ড্রাইভ রোড, আমি জানি। রাস্তাটাও প্লেন, একদম ঝাঁকুনি টাকুনি নেই। ভাগ্যিস নেই, থাকলে নাড়িভুড়ি চটকে যেত! একদম চাকার মাথায় সিট। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি আসছে, তারপর আবার সবুজ, আবার সবুজ। মনের তেতো ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সারা বছর ধরে কেন এমন বেড়ানো হয় না?

আর মাত্র কটা দিন, তারপর আবার গয়ংগচ্ছ। সেই ঘুম থেকে উঠেই কারখানায় ছোটা, টিফিনে বাড়ি এসে বউদির বিরস মুখ দেখতে দেখতে চাট্টি ভাত গিলে যাওয়া, ফেরা সেই সন্ধের পর। হরেনদা'টা খাটায়ও খুব, রস নিংড়ে নেয়। তা নিক, কাজকে মধু নন্দী ডরায় না। শুধু কারখানাটা যদি আরেকটু ভাল হত, যদি একটু আলো বাতাস ঢুকত, হরেনদার মুখের বুলিগুলো যদি একটু অন্য রকম হত, কটা টাকা যদি আরও বেশি দিত....!

এত চাওয়ার সময় এখন নয় রে মধুময়। এই মুহূর্তটা নিয়েই বাঁচ্ এখন। একটা গান কুনকুন করে উঠছে বুকে। ঘোড়ে জ্যায়সি চাল, হাতি জ্যায়সি দুম্, ও শাওন রাজা কাঁহা সে আয়ে তুম্....। গাই গলা ছেড়ে? থাক, শুভ্র এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে, অ্যাই গাধা, ফাল্গুনে তুই শ্রাবণ পেলি কোত্থেকে! গান মনে এলে দিন মাস অত খেয়াল থাকে নাকি? শ্রাবণ মাসে যদি গানটা না মনে পড়ে! ঠিক আছে, একটু গলা নামিয়েই নয় গাই। কী আর হবে? বড় জোর বন্ধুদের আওয়াজে বাসসুদ্ধু লোক হাসবে! এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে ক্লাউন সেজে মানুষকে হাসাতে পারাটাও তো মহাপুণ্যের কাজ।

টুটুল বাবা মা'র পাশ থেকে উঠে আসছে। টলমল পায়ে। জয়া হাত ধরে এগিয়ে দিচ্ছে মেয়েকে,—মধুদা, আপনার কাছে যাবে বলে বায়না ধরেছে।

ধরবেই তো, আমি যে টুটুলের বেস্ট ফ্রেন্ড। শিশুদের মনে প্যাঁচ পোঁচ থাকে না, ওদের সঙ্গে আমার বেশ বনে। আয় মামণি আয়।

হাঁটুর ওপর বসল টুটুল। পাশের লোকটা একটু বিরক্ত যেন। হবেই তো, সভ্যভদ্র লোক, সামান্যতম অসুবিধে সহ্য করতে পারে না।

ঘাড় ঘোরালাম,—কিছু বলবেন?

অড়ি বড়ি করে কী যেন বলল লোকটা। ইংরিজি, না তেলেগু?

গম্ভীর মুখে বললাম,—একটু মেরে বসুন, চিলড্রেন আছে।

লোকটা কী বুঝল কে জানে, উদাস হয়ে গেল।

টুটুলের কানে কানে বললাম,—দেখলি, ভয় পাইয়ে দিলাম কেমন?

—কেন ভয় পাওয়ালে গো?

—ইচ্ছে হল।

—কেন ইচ্ছে হল?

ঠোঁটে এসে গিয়েছিল, মুখোশ পরা ভদ্রলোকদের ভয় দেখাতে আমার ভাল লাগে, গিলে নিলাম কথাটা। হাসতে হাসতে বললাম,—ওরে মামণি, সব প্রশ্নেরই

যদি উত্তর দিতে পারতাম, তবে তো আমি তোর বাবার মতো প্রফেসার হতাম! ক্লাস নাইনে তিন বার গাড্ডু খেতাম না, বিনয় স্যার কথায় কথায় আমায় মুরগি করে রাখত না....

—মুরগি করা কী গো মধুকাকা?

মনে মনে বললাম, আমাকে তোর বাবা মায়েরা এখনও যা করে। মুখে বললাম,—ও আছে একটা প্যাঁচ। হাত দুটোকে হাঁটুর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে, উবু হয়ে বসে....

—আমায় শিখিয়ে দেবে? আমিও মুরগি হব।

—রাম কহো! তুমি কোন্ দুঃখে মুরগি হবে মামণি? তুমি এখনই কত কী শিখে গেছ, এ বি সি ডি, ওয়ান টু থ্রি, হাট্টিমাটিম টিম....

—ওগুলো শিখে গেলে বুঝি মুরগি হওয়া যায় না?

কঠিন প্রশ্ন। মেয়েটা ভারি ব্রিলিয়ান্ট, প্যাঁচ কষে কষে এমন প্রশ্ন করে, উত্তর খুঁজে পাওয়া ভার। জয়া অন্তু কি প্রশ্নের গুঁতো সামলাতে না পেরেই এখানে পাঠিয়ে দিল?

টুটুলের পেটে আলগোছে কাতুকুতু দিলাম, হি হি হেসে উঠল টুটুল। আরেকটু কাতুকুতু, হাসছে খিলখিল। হেসে একেবারে যাকে বলে কুটিপাটি। ঠিক জয়ার মতো হাস্যমুখী হয়েছে টুটুল, ভারি মিষ্টি, ভারি মিষ্টি।

জয়াটা খুবই ভাল মেয়ে। অন্তু সত্যিই লাকি, ওর বউটাই সবার সেরা। জয়াকে দেখলেই আমার মা'র কথা মনে পড়ে যায়। ঠিক যেন মা'র মতো করেই কথা বলে জয়া, হাসে, বকে.... জয়ার ধমক শুনলেও গা চিড়বিড়িয়ে জ্বলে ওঠে না। সুন্দর তো বন্দনাও, তবে বড্ড কাঠ কাঠ। প্রাণহীন প্রতিমার মতো। মুখটিও সর্বক্ষণ ভেটকে আছে, ঠিক যেন আমার বউদিটি। ছটার জায়গায় সাতটা রুটি খেলেই কপাল জুড়ে ভাঁজ, এত যে গিলছ, আটার দামের খবর রাখো! মিত্রা আবার যেন কেমন কেমন। দেখতে বেশ, লম্বা চওড়া ফর্সা। আমার মা ছিল ছোট্টখাট্টো, নরম সরম, এত বড়সড় চেহারার মেয়ে দেখলে আমার যেন কেমন অস্বস্তি হয়। যেন অনেক দূরের কেউ, আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। মিত্রাকে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি, চোখাচোখি হলেই বুক ধড়ফড়। কেন এমন হয়?

কথা বলতে বলতেই টুটুল ঢুলতে শুরু করেছে। আর প্রশ্ন করবে কি, গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগতেই মেয়ের দম শেষ। কিচ্ছু দেখছে না, কত সুন্দর সুন্দর সব বালিয়াড়ি চলে যাচ্ছে পর পর। ওই তো একটা, ঠিক যেন উটের কুঁজ।

বুকটা কেঁপে উঠল। অমনই এক বালিয়াড়ির ওপারে কাল বসে ছিল ওরা দুজন। পুলু আর মিত্রা। শুভ্র অন্তু কাল হোটেল থেকে বেরোলই না, জয়াও হোটেলে রয়ে গেল, আর বন্দনা তো কাল সারাদিন বিছানায়। এমনকি টুটুলেরও মুড খারাপ, ঘ্যানঘ্যান করছিল, অন্তুর কাছ থেকে নড়লই না। আমারও যে খুব বেরোনোর ইচ্ছে ছিল তা নয়, পুলুর টানাটানিতেই অগত্যা....।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সমুদ্রের পাড়ে। পুলু হঠাৎ উশখুশ করতে শুরু করল। আচমকা মিত্রা বলল,—মধুদা, একটা কাজ করে দেবেন? প্লিজ যদি কিছু মনে না করেন....

মধুর মনে করায় কার কী এসে যায়! বন্ধু বা বন্ধুপত্নীদের হুকুম তামিল করাই তো তার ভবিতব্য। বললাম,—বলো, কী করতে হবে?

—আমার জন্য একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট এনে দেবেন?

দুম করে ছবিটা আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল। একা দুজনে বেরোলে খারাপ দেখায়, তাই আমাকে সঙ্গী করা হয়েছে! এখন আমিই কাবাবমে হাড্ডি। অথচ মিত্রা যখন বলছে, মুখের ওপর না বলাও যায় না।

কাঁধ ঝাঁকালাম,—যাচ্ছি। ....তোমরা এখানেই থাকবে তো?

—না থাকলে খুঁজে নেবেন। কি, পারবেন না?

ওষুধের দোকান সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা দূর। ক'পা হেঁটেই কী যেন একটা বিক্রিয়া ঘটল আমার মধ্যে, থেমে গেলাম। কেন আমি এইভাবে বক্‌রা বনব বার বার? কী এমন নিষিদ্ধ কাজ করবে পুলুরা, যে আমি সেখানে অবাঞ্ছিত? না হয় একটু দূরেই বসতাম আমি, সমুদ্রের ঢেউ গুনতাম।

একটা অন্য মধুময় আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলল অন্য পথে। সমুদ্রতীরে ভিড়ভাট্টা ভালই, তাদের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম আমি। গোয়েন্দার চোখে নজর রাখছি কোন্ দিকে যায় যুগলে। আগের দিন কিছু না ভেবেই ওদের পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু কাল আমি ছিলাম অতি সতর্ক, এবং সচেতন। হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না, ওরা হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, ফিরেও তাকাচ্ছে না, আমার দিকে তাকানোর ওদের অবকাশ কই! নির্জন জায়গা দেখে বসল দুজনে। ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ওরা। আরও ঘনিষ্ঠ! পুলুর ঠোঁট মিশে গেল মিত্রার ঠোঁটে!

আমার শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। এক তীব্র আগুন, যা দিয়ে গোটা পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া যায়। দেহ জুড়ে পাল পাল বুনো জন্তু গরম নিশ্বাস ছড়াচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে জিভ টাগরা কণ্ঠনালী। কেন আমিই থাকব

চিরকাল বঞ্চিতের দলে? মাত্র বারোশো টাকা মাইনে পাই বলে? ইস্কুলের গণ্ডিটাও পার হতে পারি নি, তাই? সবটাই কি আমার দোষ? বাপ মা মরা ভাইকে গরুর মতো খাটাত দাদা বউদি, নিজে মাস্টার হয়েও জন্মে কখনও আমাকে পড়া দেখিয়ে দেয় নি, এক পয়সা খরচ করে নি আমার জন্য। হ্যাঁ, মাথা আমার একটু মাটো ছিল বটে, কিন্তু মাধ্যমিকটাও কি আমি উৎরোতে পারতাম না? একটু সাহায্য পেলে? উল্টে দাদা গল্প চাউর করে দিল, ছোটবেলায় মেনিনজাইটিস হয়ে ভাইটা আমার নিরেট হয়ে গেছে!

আশ্চর্য, বন্ধুরাও কথাটা গিলে নিল!

সেই বন্ধুরা এখন সুখে ঘরকন্না করছে। মিত্রাকে চুমু খাচ্ছে পুলু!

শরীরে আগুন নিয়েই সরে এলাম আমি। চাবুক খাওয়া কুকুরের মতো যন্ত্রণাটা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে, তখনই একবার ফিরেছিলাম পুলুদের দিকে। আর দেখা যাচ্ছিল না পুলুদের, ওরা তখন বালিয়াড়ির ওপারে। ঠিক ওই রকমই এক বালিয়াড়ি, উটের কুঁজের মতো।

কতক্ষণ পর আবার এলাম সমুদ্রতীরে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? সময়ের হিসেব ছিল না। গোটা পাড় জুড়ে তখন ঘন অন্ধকার।

ট্যাবলেট বাড়িয়ে দিলাম মিত্রাকে। ঠাণ্ডা গলায় বললাম,—ধরো।

মিত্রার মাথা তখনও পুলুর বুকে, পুলুর হাত মিত্রার কাঁধে। আমাকে দেখেও একটু সরে বসে নি ওরা।

ওষুধটা হাতেই নিল না মিত্রা। মুচকি হেসে বলল,—ওটা আপনার পকেটেই রেখে দিন। এখানে জল কোথায় যে খাব?

বটেই তো, জল আনাটাও তো মধুময়েরই কর্তব্য ছিল! এই সমুদ্র কিনারে।

আরও ঠাণ্ডা গলায় বললাম,—চাঅলা ডাকব? চা দিয়ে খাবে?

পুলুর বোধহয় আমায় দেখে করুণা হল। মিত্রার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, —ছেড়ে দে।

—কিন্তু মিত্রার মাথা ধরা?

—উবে গেছে। চুপ করে বোস্, সমুদ্র দ্যাখ।

এই পুলু আমার বন্ধু! এরকমই বন্ধুর সঙ্গের জন্য লালায়িত থাকি আমি। কেন থাকি? এরা আমার চেয়ে সফল বলে? নাকি আমি এদের মতো হতে চাই বলে? কেন আমি মিত্রার মতো একটা বউ পাব না, একটা নিখাদ মেয়েমানুষ?

—কী রে, টুটুল কি ঘুমিয়ে পড়ল?

অন্তর ডাকে ভাবনা ছিঁড়ে গেল। পলকে ঢুকে পড়েছি চেনা মধুর খোলসে। হেসে বললাম,—হ্যাঁ রে, এক্কেবারে কাদা।

সামনে থেকে বন্দনা বলে উঠল,—ওকে আমার কাছে দিয়ে দিন।

টুটুল সরে যেতে ভার খানিকটা লাঘব হল। জয়ার হাতে চায়ের ফ্লাক্স, ভায়া শুভ্র আমার কাছে পৌঁছে গেল। ঢেলেছি ঢাকনা-কাপে, চুমুক দিচ্ছি সড়াৎ সড়াৎ। ভাল লাগছে বেশ, মাথা হাল্‌কা হচ্ছে। নাহ্, এই জন্যই জয়াটা সেরা বউ।

শুভ্র ঘাড় হেলাল,—আস্তে খা। অত শব্দ করছিস কেন?

—বা রে, চা খেলে শব্দ হবে না?

—আমাদের হয়?

লে হালুয়া, আমি আর তোরা সমান? নিঃসাড়ে কোন্ কাজটা করতে পারি আমি, তোদের মতো? প্রেম হিংসে আর স্বার্থপরতার খেলা যদি আমিও চুপিসাড়ে চালাতে পারতাম?

একটা তালঢ্যাঙা লোক ড্রাইভারের কেবিন থেকে গেটের মুখে এসে দাঁড়াল। হাতে মাউথপিস, কোনার্ক মন্দিরের জন্ম ইতিহাস শোনাচ্ছে। যত্ত সব ভ্যাজারং ভ্যাজারং। বাসসুদ্ধ লোকের আক্কেল দ্যাখো, ইস্কুলের ছেলেদের মতো হাঁ করে গিলছে! মন্দির কবে তৈরি হয়েছে জেনে পরীক্ষায় বসবে নাকি? পৌঁছলে তো আস্ত মন্দিরটাই দেখতে পাবে।

লোকটাকে একটু ঝেঁকে দিতে ইচ্ছে হল। ইয়া বড় এক হাই তুলে প্রশ্ন ছুঁড়লাম,—ও মোয়াই, বাইরে কী দারুণ কাজুবাদামের গাছ, সে নিয়ে কিছু বলছেন না যে?

ব্যস্, লোকটা হোঁচট খেয়ে গেল। মুখস্থ বিদ্যে ঘুলিয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল,—হ্যাঁ, বলছি। ....দু পাশে এই যে গাছপালা দেখছেন, এ সবই উড়িষ্যার জঙ্গলের অংশ।

—যাহ্ বাবা, জঙ্গলে কাজুবাদাম? ....জঙ্গলে বাঘ নেই?

যা ভেবেছি তাই, বাসসুদ্ধু লোক খ্যাঁ খ্যাঁ হেসে উঠেছে। নাহ্, আমার ক্লাউনজন্ম সার্থক।

অন্তু পিছন ফিরে চোখ পাকাল,—একদম কথা নয়, মুখে চাবি এঁটে বসে থাক।

অন্তুর হুকুম, অমান্য করি সাধ্য কি! খরচ খরচা দিয়ে সঙ্গে এনেছে, একটা কৃতজ্ঞতাবোধও তো আছে। যদিও বেগার খেটে উশুল করে দিচ্ছি, তবু....

চুপ করলাম, তো ঘাড়ও সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে গেল। তন্দ্রা ভাঙল চাপা

কলরোলে। বাসসুদ্ধু লোকের চোখ ডান দিকের জানলায়, হৈ হৈ করে কী যেন দেখছে!

সেই ব্যাটা মাউথপিস হেঁকে উঠল,—ওই ওই, ওই হল রামচূর্ণী নদী। ওই নদী তিন ভাগে ভাগ হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। তাকিয়ে থাকুন, এক্ষুনি মোহনা দেখতে পাবেন।

উঁকিঝুঁকি দিয়ে হতাশ আমি,—দূর মশাই, ও নদী কোথায়, ওটা তো একটা খাল। সমুদ্রের ঢেউগুলো খালে ঢুকছে।

আবার বাস জুড়ে হাসির রোল।

শুভ্র ধমকে উঠল,—অ্যাই পাঁঠা, ওটা খাল নয়, নদী। সাগরে গিয়ে পড়ছে।

কী অন্যায় কথা, মিত্রার পর্যন্ত হাসি থামছে না।

ক্লাউনেরও বোধহয় বিরক্তি আসে। ঝেঁঝে উঠে বললাম,—যা খুশি বোঝালেই হল? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না ঢেউগুলো এক পাল শুশুকের মতো খালে চলে আসছে?

—আইব্বাস্, তুই যে কবিতা আওড়াচ্ছিস রে!

সকলের দেখার চোখ কি এক ছাঁচে ঢালা হয়? আমার যেমনটা মনে হয়, তেমন আমি বলতে পারব না?

কথা বাড়ানোর আর প্রবৃত্তি হল না। ফিরে গেলাম পুরনো পোজে। ঘুমই ভাল, ঘুমেই শান্তি।

এক সময়ে কোনার্ক এসে গেল।

হাই তুলতে তুলতে বাস থেকে নামলাম। টুটুলও জেগে গেছে, সে এখন শুভ্রর সঙ্গী। পাশেই হোটেল, বেলা বেড়েছে, অন্তু সেখানে ভাতের অর্ডার দিতে গেল। আমি জয়া আর বন্দনা পাশাপাশি চলেছি, সামনে মিত্রা আর পুলু যথারীতি আলাদা আলাদা।

কোথথেকে গোটা তিন চার গাইড এসে ছেঁকে ধরল। পঞ্চাশ টাকা দিলে মন্দিরের ইতিহাস ভূগোল সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দেবে। শুভ্র তাদের পাত্তাই দিল না, ওর কোনার্ক ঘোরা আছে, গাইডের ভূমিকাটা নাকি নিজেই নিতে পারবে।

বন্দনা দু পা হেঁটেই কাহিল, বসে পড়ল গাছের ছায়ায়। অন্তু চলে এসেছে, হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল,—কী হল? আবার শরীর খারাপ লাগছে?

বন্দনা মাথা দোলাল। নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে।

অন্তু অসহায় চোখে তাকাল আমাদের দিকে,—এই, আমি একটু বন্দনার সঙ্গে বসি, তোরা ঘুরে আয়।

জয়াও ওমনি ঝুপ করে বসে পড়ল,—আমিও বাবা তাহলে একটু রেস্ট নিই।

অন্তু বলল,—আহা, তোমরা যাও না। স্কালপ্‌চারগুলো দেখে এসো। মারভেলাস, চোখ ফেরাতে পারবে না।

শুভ্র চোখের কোণ দিয়ে বন্দনাকে জরিপ করছিল। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল,—চলো জয়া, বন্দনাকে ভাল করে রেস্ট্ নিতে দাও।

কী একটা যেন নাটক চলছে! পাত্রপাত্রীরা কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করছে ঠিক ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু নাটক একটা চলছেই।

শুভ্র-জয়ার পিছন পিছন চলেছি আমি। টুটুল দৌড়ে দৌড়ে একবার শুভ্র জয়ার কাছে যাচ্ছে, একবার ফিরে আমার কাছে। এখনও তার প্রশ্নের শেষ নেই। চাকাগুলো অত বড় বড় কেন গো? এত এত পাথর এল কোথ্‌থেকে? কে পাথর কাটল গো? সূর্যকে কেন পুজো করে, সূর্য কি ভগবান?

সাধ্য মতো উত্তর দিচ্ছি। হাঁটছি। দেখছি পাথরে খোদাই করা সার সার মূর্তি। কী অসভ্য ভঙ্গি সব! ওই ভাবে কি রমণ করে নারীপুরুষ? ভাগ্যিস টুটুল পাশে আছে, জয়া মিত্রারা কেউ থাকলে ওদিকে তাকানোই যেত না।

শুভ্রর গলা কানে এল,—বুঝলে জয়া, এসব মূর্তি দেখে অনেকে অনেক রকম ধারণা করে। আসলে কাম ক্রোধ লোভ হিংসে সব ত্যাগ করে পবিত্র স্থানে যেতে হয়, তাই মন্দিরের বাইরে এসব....ওই দ্যাখো, একটা হাতির নীচে সিংহ পড়ে আছে, সিংহের নীচে মানুষ, এর মানে কি জানো? মানুষ পরাজিত শৌর্যের কাছে, সেই শৌর্য আবার বিশালত্বের কাছে অসহায়।

জয়া শুনছে মন দিয়ে। ঘাড় নাড়ছে।

জয়ার হাত ছেড়ে টুটুল আবার আমার কাছে এল,—বিশালত্ব মানে কি মধুকাকু?

শুভ্র জয়া ঘাড় ফিরিয়ে হেসে উঠল। শুভ্র বলল,—বিশালত্ব মানে প্রকাণ্ড কিছু। এই যেমন তোমার মধুকাকু।

—আর অসহায় মানে?

টুপ করে শুভ্রর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। চোরা চোখে তাকাল জয়ার দিকে, জয়াও। অন্যমনস্ক মুখে আবার হাঁটছে দু জনে। রোদ বেশ চড়া এখন, পায়ের তলার পাথর বেশ তেতে উঠেছে। এক পা এক পা করে উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠলাম আমরা। তিন দিকে তিনটে সূর্যমূর্তি। নোনা ধরা, ধ্বংসস্তূপের মতো। এই মূল মন্দিরটার সামনে নাট মন্দির, পিছনে সূর্যের স্ত্রী

ছায়া মায়ার মন্দির, সবই এখান থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান। পল্লব আর মিত্রা ছায়াদেবী মায়াদেবীর মন্দির ঘুরছে, টুটুল চেঁচিয়ে ডাকল ওদের, ওরা হাত নেড়ে সাড়া দিল। নগ্ন মূর্তির দিকে আঙুল তুলে কী যেন বলল পুলু, মিত্রা মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠল।

আমার আর ভাল লাগছিল না। নেমে এলাম পায়ে পায়ে। একা একাই ঘুরছি মন্দিরকে বেড় করে। ওই ছায়া মায়ার মন্দির, ওই নাটমন্দির যেখানে এক সময়ে নাচত দেবদাসীরা, পড়ে থাকা ওই বিপুল ভগ্নস্তূপ, হাতি, সিংহ, রথের চাকা, ওই মৈথুনরত যক্ষ যক্ষিণী—সব মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে বুকে। বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে আমার। এমন এক অনুভূতি যাকে ব্যাখ্যা করার আমার ক্ষমতা নেই, অথচ ছমছম করে ওঠে গা।

হঠাৎ কেন এত ভয় করছে আমার?

দ্রুত পা চালিয়ে ফিরলাম গাছতলায়। বন্দনা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে, পাশে চিন্তিত মুখে অন্তু।

ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম,—বন্দনা এখন কেমন?

অন্তু মাথা তুলল,—ভাল নয় রে। বলছে ভীষণ মাথা ঘুরছে। বমি বমি ভাবটাও বেড়েছে।

—কী হবে এখন? সারাটা দিন এখনও বাসজার্নি বাকি....

—তাই তো ভাবছি। ....ভুবনেশ্বর টুবনেশ্বর বাদ দিলে কেমন হয়?

—সে নয় দিলি। কিন্তু ফিরবি কী করে?

—আজ ফিরব না। এখানে পান্থনিবাসে থেকে যাব।

—দ্যাখ্, সবাই কী বলে।

কথার মাঝেই টুক টুক করে এসে গেছে শুভ্র পুলুরা। প্রস্তাবটা শুনে পুলু প্রায় লাফিয়ে উঠল,—গ্র্যান্ড আইডিয়া। ফালতু ফালতু আরও কটা মন্দির দেখে কী হবে? বন্দনা যেমন নেতিয়ে পড়েছে, ফারদার স্ট্রেইন করাটাও একদম ঠিক নয়।

এখানকার পান্থনিবাসের দারুণ চাহিদা, আগে থেকে বুক না করে এলে জায়গা পাওয়া কঠিন। কপাল ভাল, আজ সকালে কিছু জাপানী ট্যুরিস্ট চলে গেছে, এক রাতের জন্য মিলবে পান্থনিবাস।

হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে পুলুর গলা কানে এল,—ভালই হল, না মিত্রা? রাত্তিরবেলা আরেক বার মন্দিরটা দেখা যাবে। চাঁদের আলোয়।

আবার গা ছম ছম করে উঠল আমার। কেন এমন হচ্ছে বার বার?

কোনার্ক ও মধুময় : দুই

দুপুরটা নিস্তরঙ্গ কেটে গেল। খেয়ে শুয়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে।

মন্দির ছাড়া এখানে প্রায় কিছুই দেখার নেই। এক আছে সমুদ্র, যা এক কালে মন্দিরের পাশে ছিল, তাও এখন সরে গেছে অনেকটা দূর। বিকেলে বললাম সকলকে, চল্ সমুদ্রই দেখে আসি, তা কেউ তেমন গা করল না। আজকের হোল্‌ডে ট্যুর আধাখেঁচড়া হয়ে গিয়ে সবার মধ্যেই কেমন ঝিমুনি এসে গেছে, নড়তে চড়তে সকলের ভারি আলস্য।

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লাম, টুটুলকে নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছি বহু দূর, সেই সমুদ্রের পাড়। সমুদ্র এখানে ভীষণ নির্জন, রুক্ষ। ঢেউ-এর কোনও ছিরিছাঁদ নেই, খ্যাপা মোষের পালের মতো শুধু পাড়ে ধেয়ে আসছে। তবে নীলটা বড় অপরূপ, জল যেন তুঁতে বরণ।

ওই সমুদ্রকে দেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার। অন্তু বলছিল, মন্দিরের মাথায় নাকি এক সময়ে চৌম্বক কলস বসানো ছিল। সেই কলস নাকি মাঝ-সমুদ্রের জাহাজকেও হিঁচড়ে টেনে আনত পাড়ে, আছড়ে চুরমার করে দিত। কল্পচোখে ভেসে উঠছিল দৃশ্যটা, শুনশান সমুদ্রে। কী আজব খেয়াল ছিল রে বাবা রাজা মহারাজাদের! শুধু মজা পেতেও কত শয়ে শয়ে জাহাজ ডুবিয়েছে! সমুদ্রের এই সরে যাওয়া কি প্রকৃতির প্রতিশোধ? মন্দিরের আজ যে জরাজীর্ণ দশা, সেও কি হাজার হাজার হতভাগ্য নাবিকের দীর্ঘশ্বাসের ফল? এটাই বোধহয় নিয়ম। অন্যের ক্ষতি করে নিজে বেশিদিন সুখে থাকা যায় না। দুঃখী মানুষের অভিশাপ বড় ভয়ানক, তাকে এড়ানো বেজায় কঠিন, এমনকি দেবমন্দিরের পক্ষেও।

টুটুল জল দেখেই আত্মহারা। পা ছোঁয়াবে বলে কী বায়না মেয়ের! আমি একদম কাছে ঘেঁষতে দিই নি। এবার ট্যুরটা যেন কেমন ছানা কেটে গেছে, দুম করে নতুন ঝঞ্ঝাট ডেকে না আনাই ভাল।

ফিরলাম সন্ধে গড়ানোর পর। ফিরেই অবাক, সব ঘর ভোঁ ভাঁ, তালা ঝুলছে। হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করতে সে হাত উল্টে দিল। আশ্চর্য, বেরোবে না বলেও গেল কোথায় সব?

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। মন্দির চত্বর চষে ফেললাম দুজনে। নেই। কাছে ছোটখাটো বাজার মতো আছে একটা, সেখানে গেছে কি? উঁহু, সেখানেও নেই। টুঁড়ে টুঁড়ে ক্লান্ত যখন, দর্শন মিলল। মন্দির থেকে বেশ খানিক তফাতে এক

গাছতলায় বসে আছে সকলে। গোল হয়ে, অনেকটা ছেলেবেলার সেই রুমালচোর খেলার ভঙ্গিতে।

আমাদের দেখে পুলু চেঁচিয়ে উঠল,—কী রে ছাগল, তোর চরা শেষ?

কথা শুনে মনে হল নেতিয়ে পড়া পরিবেশ চাঙা হয়েছে কিছুটা। হেসে বললাম, —চরব যে এখানে ঘাস কোথায়? শুধুই বালি....

—সাবাশ, কী ডায়ালগ রে! টুটুল কি তোকে ট্রেনিং দিচ্ছে?

ছোট্ট একটা হাসির তুফান উঠল। বন্দনাও মিটিমিটি হাসছে। যাক, সারাদিন আজ ধকল না নিয়ে ভালই করেছে। মানে মানে এখন কাল সকালে পুরী ফিরলে হয়।

টুটুল লাফিয়ে চলে গেল জয়ার কাছে, বিনবিন করছে কী যেন। জয়া ব্যাগ খুলে ক্রিমবিস্কুট দিল মেয়ের হাতে। অন্তু আর শুভ্র কথা বলছে নীচু স্বরে। মিত্রা কেমন একটু উদাসীন। দেখছে আকাশ, দেখছে চরাচর।

পৃথিবী এখন সত্যিই মায়াময়। এই মাত্র চাঁদ উঠল, পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেল দশ দিকে। মিহি আলো মেখে সূর্যমন্দির চন্দ্রাহত যেন, ভাঙাচোরা প্রাচীন স্থাপত্যটাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে। সকালের চেনা মন্দির এখন এক অচিন পুরী।

পুলু হঠাৎ বলে উঠল,—কী দারুণ একটা স্বপ্ন স্বপ্ন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল মাইরি!

অন্তু বলল,—আজ তাহলে এখানে থেকে গিয়ে ভালই হয়েছে বল্?

—ভাল কী রে, বল্ মোর দ্যান ভাল। গুড বেটার বেস্ট। নন্দন কাননে গিয়ে কী দেখতাম? সেই তো কটা বাঘ সিংহ বাঁদর হরিণ। ও তো ক্যালকাটা জু'তেও গেলে দেখা যায়। পাল পাল।

শুভ্র বলল,—এখন বেশ জোর একটা ইতিহাসের স্মেল পাওয়া যাচ্ছে না?

মিত্রা ঘুরে তাকাল,—স্মেল কী বলছেন শুভ্রদা, ইতিহাস তো এখন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। ওই দেখুন, ওই যে নাটমন্দির, ওখানে এক্ষুনি নাচ শুরু করবে দেবদাসীরা। নূপুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না? ওই তো কলিঙ্গরাজ এবার নাটমন্দিরে আসছেন....

কথা ফুরোনোর আগেই চার দিক আরও নিঝুম হয়ে গেল। সত্যি সত্যি বুঝি নূপুর বেজে উঠল নাটমন্দিরে, মৃদঙ্গ বোল তুলল। ধিক্ তাং ধিক তাং ধিক তাং, রিনিঝিনি রিনিঝিনি রিনিঝিনি....। মিত্রা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে

চলেছে মন্দিরের কাছে। আমরা সবাই চুপ, মুখে কুলুপ আঁটা, দেখছি মিত্রাকে। এমনকি পুলুও নিথর।

আচমকাই ছিঁড়ে গেল দৃশ্যটা। কোথ্থেকে একটা অশ্লীল সিটি বেজে উঠল। ঘোর ভেঙে চমকে তাকিয়েছি সকলে। দ্যাখ্, না দ্যাখ্ গোটা পাঁচেক ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে মিত্রার সামনে, এক সঙ্গে সাইকেলের বেল বাজাচ্ছে।

জয়া চিৎকার করে উঠল,—এই মিত্রা, চলে আয়।

বন্দনা গজগজ করে উঠল,—কোথ্থাও একটু শান্তিতে বসার জো নেই!.... যান না পল্লবদা, দেখুন না।

মিত্রাই পিছিয়ে আসছিল, উড়ে আসা এক অশালীন শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে দুমদাম এগিয়ে গেল কয়েক পা, —ব্যাপারটা কী, অ্যাঁ? ট্যুরিস্টদের সঙ্গে এমন বিহেভ করতে লজ্জা করে না? পুলিশে খবর দিলে সব কটাকে একেবারে চাবকে সিধে করে দেবে।

হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল ছেলেগুলো। নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করল, আবার হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে চোখা চোখা মন্তব্য।

আর দেরি করা নয়, উঠেই প্রায় দৌড়েছি আমরা। মিত্রা বুঝি আমাদের দেখে জোর পেল অনেকটা, কড়া গলায় বলল,—ভাগ, ভাগ্ এখান থেকে। নইলে এমন ঝাড় খাবি....

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলোর মুখ চোখ বদলে গেছে। সাইকেল ফেলে এক সঙ্গে এগিয়ে এসেছে মিত্রার দিকে। একটা ষণ্ডা মতন ছেলে খপ্ করে মিত্রার হাত ধরে টানল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলেছে মিত্রা, পাল্টা চড় কষিয়েছে ছেলেটাকে।

অন্তু হাঁ হাঁ করে মাঝখানে গিয়ে পড়ল,—হচ্ছেটা কী? যান না আপনারা। কেন ঝামেলা করছেন?

চড় খাওয়া ছেলেটা মুহূর্তের জন্য থমকেছিল, পরক্ষণেই খ্যাপা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্তুর ওপর। অন্য একজন হিড়হিড় করে টানল মিত্রাকে। এলোপাথাড়ি হাত চালাচ্ছে মিত্রা, নিজেকে ছাড়াতে পারছে না, ডুকরে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এক লাফে ছেলেটার টুঁটি চেপে ধরেছি। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ঘুষি চালালাম ছেলেটার তলপেটে, অঁক করে ককিয়ে উঠল ছেলেটা, উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। পলকে আরেক জন কোমর থেকে ছুরি বার করেছে, আমার দিকে তেড়ে এল। চকচকে ছুরির ফলা

বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে আসছে আমার পেটের দিকে, শরীর ছোঁয়ার আগেই ধরে ফেললাম হাতখানা। মুচড়োচ্ছি, মুচড়োচ্ছি.... স্প্রিং-টেপা ছুরি ঘষে যাচ্ছে কাঁধে....

পুলু নার্ভাস গলায় বলে উঠল,—মন্দিরের দিকে গার্ড আছে না? দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনব?

অন্তু বলল,—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা না।

শুভ্র মিত্রাকে টেনে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে। হাঁক ছাড়ল,—ছেড়ে দে মধু, সরে আয়।

কক্ষনো না, কেন সরবো? মোচড়ের সঙ্গে জোর ঝটকা মারলাম একটা, ছুরি ছিটকে গেল বালিতে। চুলের মুঠি ধরে সাপটে ধরলাম ছেলেটাকে, হাঁটু দিয়ে আঘাত করলাম পেটে। নুয়ে পড়ল ছেলেটা, সবেগে লাথি চালালাম। সাত হাত দূরে গিয়ে ছেলেটা গড়াচ্ছে এখন, কেঁউ কেঁউ করছে। কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াল, তার পরই সাইকেল নিয়ে ভোঁ দৌড়। বাকিরাও সাইকেলে চেপে পালাচ্ছে।

মিনিটের মধ্যে পাঁচ মূর্তি উধাও।

উত্তেজনা কাটতেই নজরে পড়ল কাঁধ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

জয়া কাছে এসে শিউরে উঠল,—ওমা, এ তো অনেকটা কেটে গেছে! ইশ, কী হবে এখন?

আলগা হাত বোলালাম কাটা জায়গাটায়। বললাম,—না না, ও কিছু না। সামান্য একটু ঘষা লেগেছে।

—মোটেই সামান্য নয়। এত রক্ত পড়ছে....বলতে বলতে ব্যাগ খুলে রুমাল বার করল জয়া। ধবধবে ফর্সা রুমাল চেপে ধরেছে আমার কাঁধে,—চলুন, এক্ষুনি গিয়ে ওষুধ লাগাতে হবে।

বন্দনা বলল,—আমার কাছে ব্যান্ডেজ আছে। ভাল করে বেঁধে দিতে হবে জায়গাটা। ....উফ্, ধন্য সাহস বটে আপনার! ওই রকম একটা ছুরিঅলা রাফিয়ানের সঙ্গে লড়ে গেলেন!

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কী বা এমন বাহাদুরির কাজ করেছি আমি! আমাদেরই এক বন্ধুর বউ-এর সঙ্গে কটা ছেলে এসে ইতরামি করবে, আর আমি চুপচাপ হজম করব? এও কি হয়? যা করেছি তার থেকে কম কিছু করলে নিজের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারতাম? ওই তো একটু কাটা, রাত পোহালে তার চিহ্নই থাকবে না....

এতক্ষণে ফিরেছে পুলু, সঙ্গে মন্দিরের এক প্রহরী। পরনে খাকি প্যান্টশার্ট, হাতে মোটা লাঠি, বয়স বোধহয় কুড়িও ছোঁয় নি। রক্ত টক্ত দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল ছোকরা, ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

শুভ্র ছেলেটাকে খেঁকিয়ে উঠল,—আপনাদের এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কি কিছু নেই? থানা কোথায় আপনাদের? চলুন আমার সঙ্গে। রিপোর্ট করব।

ঘাড় ঝুলে গেল ছেলেটার।

বেচারার মুখ দেখে আমার মায়া হল। বললাম,—ছেড়ে দে ওকে। যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর কিছু করতে হবে না।

—কেন ছাড়ব? মামদোবাজি? ট্যুরিস্ট স্পটে এসব বাঁদরামো চলবে, তার একটা প্রোটেস্ট হবে না?

বন্দনা ঠোঁট বেঁকাল,—এখন খুব বুলি ফুটেছে দেখি! এদিকে গণ্ডগোলের সময়ে তো হাঁটু কাঁপছিল!

শুভ্রর মুখ নিমেষে কালো।

তড়িঘড়ি বললাম,—আহ্, চলো তো ফিরি।

ছাড়া পেয়ে প্রহরী ছেলেটাও বাঁচল যেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা দিল মন্দিরের দিকে। প্রায় ওই গুণ্ডাগুলোর মতোই।

পান্থনিবাসের পথে পায়ে পায়ে চলেছি আমরা। অন্তুর কোলে টুটুল। ভয় পেয়ে কাঁদছিল মেয়েটা, এখন ড্যাবড্যাব তাকাচ্ছে আমার দিকে। পুলু আমার হাত ধরল, চাপ দিচ্ছে মৃদু। এই প্রথম পুলু আমার কোনও কাজের জন্য আমাকে গাড়োল বলছে না।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বসলাম বারান্দায়। সিগারেট ধরিয়েছি। কমই খাই সিগারেট, দিনে তিনটে কি চারটের বেশি কখনই না। আজ বেশ লাগছে সিগারেটের স্বাদ। মস্তিষ্কে কাজ করছে ধোঁয়া, মাথা এখন তুলোর মতো হাল্কা। সন্ধের ঘটনাটা ফিরে ফিরে আসছে মনে। ইশ, ব্যাটা বদমাশগুলো বড় অল্পে ছাড়া পেয়ে গেল। গোটা দুয়েকের মুখ ফাটাতে পারলে বেশ হত। শালা, টিমের মেয়েদের সঙ্গে মাজাকি, অ্যাঁ? তাও আবার যে সে মেয়ে নয়, মিত্রা!

—মধুদা, আপনি এখনও বাইরে?

জোর ঝাঁকুনি খেলাম। মিত্রা! এই মাত্র মিত্রার কথা ভাবছিলাম, ওমনি মিত্রা আবির্ভূত সামনে!

ধড়মড়িয়ে সোজা হলাম,—এই এমনিই।....তুমি এখনও শোও নি?

—শোব।

বলল বটে, কিন্তু মিত্রা ঘরের দিকে গেল না। টানা বারান্দায় সার সার বেতের চেয়ার, টেনে বসল মুখোমুখি। দেখছিলাম মিত্রাকে, কেমন যেন অন্য রকম লাগছে মুখখানা। শুকনো শুকনো, ভার ভার। এখনও সন্ধের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি? আমার দৃষ্টির সামনে মিত্রা কেমন কুঁকড়ে যায়। হয়তো বা ঘৃণায়। হয়তো বা বিরক্তিতে। এখন কিন্তু তেমনটি হচ্ছে না! বরং চোখে চোখ পড়তেই নামিয়ে নিল মুখ, চুপ করে বসে আছে। কিছু বলবে কি? সন্ধের ঘটনাটার পর থেকে সকলেই কিছু না কিছু কথা বলেছে আমার সঙ্গে, একমাত্র মিত্রা ছাড়া।

ঝপ করে মিত্রা বলে উঠল,—আপনার ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না মধুদা।

এমন কথার জন্য তৈরি ছিলাম না। বললাম,—কীসের ঋণ?

—জানেন না? মিত্রার গলা ধরা ধরা শোনাল,—আপনি না থাকলে আজ....আর কেউ তো....

—আরে দূর, ছাড়ো তো। হাল্‌কা ভাবে উড়িয়ে দিতে চাইলাম মিত্রাকে। লঘু সুরে বললাম,—তুমিও তো, ওই যে কী বলে, কম বীরপুরুষ নও। দিব্যি একা একাই লড়ে যাচ্ছিলে।

—যাহ্‌। মিত্রা হেসে ফেলল,—আমার এমন দুমদাম মাথা গরম হয়ে যায়, খেয়াল থাকে না কোথায় কারা সামনে আছে....

—আমারও তো তাই। রাগের মাথায় একটু বেশি জোশ দেখিয়ে ফেলেছি।

—উঁহু, রাগের মাথায় নয়।

—তবে? মুখটা হাঁ হয়ে গেল আমার।

—আপনি জানেন না, আপনি সবার থেকে আলাদা। কেউ যা পারে না, আপনি তা অনায়াসে পারেন। আপনি একা বুক চিতিয়ে লড়তে পারেন। কটা মানুষ পারে এরকম?

কী বলছে মিত্রা? বত্রিশ বছর বয়স হতে চলল, এমন কথা কোনও মেয়ে বলেছে আমাকে?

মিত্রা আবার ফিসফিস করে বলল,—আমার এতদিন ভুল ধারণা ছিল মধুদা। সরি, এক্সট্রিমলি সরি।

সুন্দর একটা বাতাস বইছে। মিত্রা চলে যাওয়ার পরও বসে আছি, বসেই

আছি। বুকটা কেমন চিনচিন করছে। আনন্দে? পুলু অন্তু শুভ্র কেউ যা পারে না, আমি তা পারি? কান্না আসছে কেন হঠাৎ?

ঘরে যেতে আর ইচ্ছেই করছে না। নেমে এলাম লনে। গেট পেরিয়ে এলোমেলো পথে হাঁটছি। মাথার ওপর এক তারায় ছাওয়া আকাশ, এক কোণে ঝুলছে নৌকোর মতো চাঁদ, নিঝুম নিরালা রাতে হাওয়া বইছে শনশন....আহ্, বেঁচে থাকাটা কী সুখের! গলা ছেড়ে গান গাইব? ধেই ধেই নাচব? পাঁই পাঁই ছুটব? বালিতে গড়াগড়ি দেব? থাক গে, এই গভীর রাতে কেউ দেখে ফেললে হয়তো আমাকে পাগলা গারদেই ঢুকিয়ে দেবে।

কতক্ষণ একলা হেঁটেছি হিসেবই নেই, পান্থনিবাসের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ও-পাশের ঝোপ ঝোপ জায়গাটায় অন্তু না? সঙ্গে কে? জয়া? না তো, জয়া তো নয়! বন্দনা! দুজনে হাত ধরে অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছে? কী ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি, ঠিক যেন কাল সমুদ্রতীরের মিত্রা আর পুলু!

দ্রুত সরে গেলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। অন্ধকারে ছায়ামূর্তি হয়ে মিলিয়ে গেল দুজনে। একটু পরেই ফিরল, ওই পথেই। ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল অন্তু, বেড়াল পায়ে বারান্দায় উঠে গেল বন্দনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তু সিগারেট খেল একটা, দু চার পা হাঁটল লনে, তারপর সেও ঘরমুখো।

ধপাস ধপাস লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড। হা ঈশ্বর, এ কী দেখলাম? কেন দেখলাম? হে ভগবান, আর কেউ দেখে নি তো? দেখলেই কেলেঙ্কারি, দেখলেই দুঃখ, দেখলেই প্রলয়। কেউ কারুর জন্য দুঃখ পাচ্ছে, একজনের জন্য অন্যের অশান্তি হচ্ছে, এই ভাবনাটাই যে কী কষ্টের!

সব ঘর বন্ধ। খোলা আকাশের নীচে বসে আছি আমি। জ্যোৎস্না মাখা আকাশে তারার ফুল ভারি নিষ্প্রভ এখন। রাতের বুক চিরে একটা পাখি ডেকে উঠল হঠাৎ, ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও পেলাম যেন। নোনা একটা গন্ধ এসে লাগছে নাকে, দুঃখের গন্ধ।

কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়! উঠেছি এক সময়ে। বারান্দা ধরে এগোচ্ছি, ঘরের কাছে এসে পা আটকে গেল। দু হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসে জয়া!

বুকে বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল। জয়ার সঙ্গে মায়ের বড় মিল!

—তুমি এভাবে বাইরে বসে আছ কেন?

মুখ তুলল জয়া, বড় একটা শ্বাস ফেলল। উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন

করল,—আপনি এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

—ঘুম আসছিল না। ঘুরছিলাম একটু। তুমি এখানে কী করছ?

—আমারও ঘুম আসছে না।

অন্ধকারে জয়ার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চোখ কি জ্বলছে জয়ার? জ্বলছে, না জল চিকচিক করছে?

হায় ভগবান, সবই কি দেখে ফেলেছে জয়া?

দায়িত্বশীল দাদার মতো গম্ভীর স্বরে বললাম,—একা একা বসে থাকতে হবে না। ভেতরে যাও। ঘুম না এলেও শুয়ে থাকো।...যাও।

আশ্চর্য, জয়া অবাধ্য হল না। গুটি গুটি পায়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। আমার গলায় কি ব্যক্তিত্ব এসেছে কোনও?

সন্ধের ঘটনাটা কি সত্যিই বদলে দিল আমাকে? অন্তত ওদের চোখে?

সমুদ্র উত্তাল

সকালটা আজ বড় মলিন। কাল কোনার্ক থেকে ফেরার পরও আকাশ ভারি ঝকঝকে ছিল। কোথ্‌থেকে এত কালো মেঘ এসে গেল কে জানে! ঝুঁকতে ঝুঁকতে মেঘ ছুঁয়ে ফেলেছে সমুদ্র, বাতাস থম মেরে গেছে। বৃষ্টি হবে কি? হলে বেশ হয়। অসময়ের বৃষ্টি বড় সুখের।

একটু আগে ওরা সবাই ব্রেকফাস্টে গেল। নীচের ডাইনিং হলে। জয়া যায় নি শুধু। টুটুলের নাকি শরীর খারাপ, গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে, জয়া টুটুলের খাবার ঘরেই যাবে।

আমারও বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছে করছে না। এ কি অবসাদ? আলস্য? জানি না। মাত্র কটা দিনে আমার সব কিছুই কেমন ওলট পালোট হয়ে গেল। অনুতোষ যেন মাতাল হাওয়ার মতো এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। মাতাল হাওয়া? না বসন্তের হাওয়া?

হ্যাঁ, বসন্তই। শুভ্রর সঙ্গে সম্পর্কটা তো এখন অনন্ত রুক্ষ শীত বই কিছু নয়।

আমি এখন কী করি? কী যে করি?

কী দেখে যে শুভ্রতে মজেছিলাম আমি? অনুতোষ তো পাশেই ছিল, কেন তাকে আগে চোখে পড়ে নি? অনুতোষ না, অন্তু অন্তু অন্তু....। ওই হল পুরুষ। পাহাড়ের মতো উদাস, শান্ত, গম্ভীর। জয়া সেদিন ভাবল আমি এমনি এমনি বলছি। ওরে বোকা মেয়ে, তুই সমুদ্রেই বিভোর থাক, পাহাড়ের মর্ম বোঝা তোর কম্মো নয়। মিত্রা ঠিকই বলেছে, শুভ্রর মতো ছ্যাবলার সঙ্গেই তোকে মানায় ভাল। জয়াকে অবশ্য আঘাত দিতে আমার খারাপ লাগছে। কী করি, পাহাড় যে নিজেই আমার কাছে চলে এল।

আকাশ পাতাল ভাবনা ঘুরছে মনে। ভাবনা, না সংশয়? অন্তুই কি আমার সত্যিকারের প্রেমিক? নাকি একটা প্যাশন? অথবা নিছকই মোহ? কিংবা বুকের শূন্যতাটুকু ভরানোর জন্য এক মুঠো কুড়িয়ে পাওয়া সুখ? বাঁচার জন্য আঁকড়ে ধরা খড়কুটো নয় তো? জয়াকে যতই উপহাস করি, অন্তু কি জয়াকে ছেড়ে আসবে কোনওদিন? কেন অন্তু বলল, আমার মন অত ছোট নয় বন্দনা, যে একজনকে ভালবেসেই ফুরিয়ে যাব? আমিই কি শুভ্রকে ছেড়ে যেতে পারব? সেই শুভ্র, যে আমার জন্য কেরিয়ার ভুলেছিল, জেদ ধরে আমার পড়াশুনো চালিয়েছে, রাতের পর রাত জেগে আমায় কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য তৈরি করেছে....! কাজটা কি নির্লজ্জ প্রতারণা হবে না? কোন্‌টা বেশি প্রতারণা?

লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম? অথবা অতীতকে মুছে ফেলে নতুন একটা আশার পিছনে ছুটে যাওয়া? যার সঙ্গে বনে না, তার সঙ্গে বাস করাটাও তো তাকে ঠকানো।

আমার কী দোষ? আমি কি একাই বদলেছি, শুভ্র বদলায় নি? আমার পায়ে কাঁকড় ফুটবে বলে যে এক সময়ে মাটিতে নিজেকে বিছিয়ে দিত, সে এখন কোথায়? আস্ত একটা কমপ্লেক্সের ডিপো বনে গেছে। কথায় কথায় বলবে, আমার নাকি রূপের দেমাক! কী অহঙ্কারটা করি আমি? সুন্দর হয়ে জন্মানো কি অপরাধ? রাস্তাঘাটে লোকজন যদি আমায় চেয়ে দেখে, আমি কি তাদের চোখে খোঁচা দিয়ে অন্ধ করে দেব? সৌন্দর্যের স্তুতি কে না ভালবাসে? শুভ্রকে কোনও মেয়ে হ্যান্ডসাম বললে শুভ্র কি মুখ ফিরিয়ে নেবে?

আসল ব্যাপার হল, শুভ্রর মাথায় বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে সে আমার যোগ্য নয়। জন্মেছে, না ছিলই চিরকাল? আমি টের পাই নি? এক ছাদের নীচে, এক বিছানায় হাজার হাজার রাত কাটিয়েও নিকটতম মানুষের কত কিছু যে গোপন থেকে যায়! কী ছোট মন শুভ্রর! সেই বিয়ের আগে বাবা ওর সঙ্গে কী আচরণ করেছিল তা এখনও মনে পুষে রেখেছে! শুভ্রর বাবা মা আমার সঙ্গে কটা দিন ভাল মুখে কথা বলেছিল? কেন আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হল? তার পরও তো শুভ্র ও বাড়ি যায়। যায় না? তাহলে?

একটা বাচ্চা হয়ে গেলে কি শুভ্র অনেক স্বাভাবিক থাকত? মনে হয় না। কত স্বামী স্ত্রীর তো সন্তান নেই, সেই সংসারের পুরুষরা কি শুভ্রর মতো খেঁকি কুকুর? ওইটুকু একটা ছেলে দীপু, নিজেরই পিসতুতো ভাই, তাকে নিয়ে পর্যন্ত....!

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। শুভ্র।

টেরচা চোখে তাকাল বিছানার দিকে,—এখনও শুয়ে আছ যে বড়?

উল্টো দিকে ফিরলাম। কথা বলার স্পৃহা নেই।

ঘুরে এসে সামনে বসল শুভ্র। সিগারেট ধরালো একটা, ইচ্ছে করে ধোঁয়া ছাড়ল মুখের ওপর। গন্ধটা আমার ভাল লাগে না জেনেও।

আবার উল্টো মুখে ঘুরতে যাচ্ছিলাম, শুভ্র কাঁধ চেপে ধরেছে,—হলটা কী? শরীর খারাপ?

—না।

—ব্রেকফাস্টে গেলে না কেন? পুলুরা অত করে ডেকে গেল!

—খাব না কিছু।

—কেন?

—ইচ্ছে।

—হুঁহ্, তোমার তো সবই ইচ্ছে। শুভ্র দাঁত কিড়মিড় করে উঠল,—লীলা করবে, সেও ইচ্ছে। কেলি করবে, সেও ইচ্ছে....

কাঁধ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম শুভ্রর হাত। উঠে বসলাম। আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। সোজাসুজি চোখ রাখলাম শুভ্রর চোখে,—কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

—বলার বাকি কী আছে? চার দিকে তো ঢি ঢি ফেলে দিয়েছ।

—বেশ করেছি। তুমিই তো বউ বদলাবদলির খেলাটা খেলতে চেয়েছিলে? কেন চেয়েছিলে? সন্দেহটা যাচাই করতে? দ্যাখো এবার সন্দেহটা সত্যি হয়ে গেলে কেমন লাগে।

শুভ্র একটু যেন হকচকিয়ে গেল। সম্ভবত এমন পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দু এক পল থমকে থেকে ফেটে পড়ল আবার,—বেহায়াপনার সাফাই গাইতে লজ্জা করে না তোমার?

—আমার কীসের লজ্জা? যার বউ বিয়ের ছ বছর পরেও অন্য পুরুষের সঙ্গে ভাবভালবাসা করে, লজ্জা তো পাবে সে।

—চোপ। চোপ। শুভ্র আঙুল নাচাল,—একটা কথা নয়। জিভ ছিঁড়ে নেব।

—হ্যাঁ, ওইটেই তো পারো। বন্ধুদের সামনে ভিজে বেড়ালটি হয়ে, ভালমানুষটি সেজে বসে থাকবে, আর বউকে ধরে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেবে, গায়ে হাত চালাবে, মুখ খারাপ করবে...। তুমি মানুষ?

—বটেই তো, বটেই তো। মানুষ তো এখন তোমার কাছে একজনই।

—অবশ্যই। তুমি তার নখের যোগ্যও নও। রাগের মুহূর্তেই মাথাটা হঠাৎ অদ্ভুত রকম শান্ত হয়ে গেল আমার। হিম গলায় বললাম,—বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় বলছি, শুনে নাও। হ্যাঁ, আমি এখন অন্তুকেই ভালবাসি, তোমাকে নয়। আমার চোখে এখন একমাত্র অন্তুই মানুষ। তুমি শুধু একটা মৃত প্রেমিক। আমি আর তোমাকে একটুও ভয় পাই না। তুমি আমার জীবন থেকে মুছে গেলে আমি শান্তি পাব।

শুভ্র স্থির মুখে কথাগুলো শুনল। পলকের জন্য দপ করে জ্বলে উঠল চোখ, পলকে মণি নিবে গেল। আধপোড়া সিগারেট গুঁজে দিল ছাইদানে, চেপে চেপে ঘষল। ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে আমার দিকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়ে নিচ্ছে মুখ।

উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল, আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে, আবার একটা....। নিঃশব্দে ঢুকে গেল বাথরুমে, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমুদ্রস্নানের পোশাক পরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহ্, মুক্তি। বুকটা অনেক হাল্‌কা লাগছে এখন, মাথার ঝিমঝিম ভাবও যেন চলে গেছে সহসা। গোটা ট্যুরে এক সেকেন্ডের জন্যও শরীর এমন ঝরঝরে লাগে নি। মনের আগল খুলতে পারলে এত আরাম হয়!

বিছানা ছেড়ে আয়নার সামনে এলাম। চোখের নীচে এখনও ঘন কালি। সব মালিন্য মুছে ফেলতে হবে, সব। পুরীতে অদ্যই শেষ রজনী, তারে-না-না করে কাটিয়ে দিতে হবে দিনটা। কলকাতা ফিরেই চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেব। বাপের বাড়ি যাওয়ার আর মুখ নেই, অন্তুর সঙ্গে সম্পর্কটাও ওরা খোলা মনে মানবে না। যা মাইনে পাই তাতে একটা ঘর টর জুটবে না? নিদেনপক্ষে কোনও মেয়েদের হোস্টেল ফোস্টেল?

জিভটা কষ্‌টে মেরে আছে। সকাল থেকে মুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয়নি। ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছি, মিত্রা এল ঘরে।

—কী রে, আবার শরীর আপসেট্?

—না না। ঠিক আছি তো।

—শুভ্রদা যে বলল তোর পেট কন্‌কন্ করছে? কী ওষুধ খাওয়ানো যায় অন্তুদাকে জিজ্ঞেস করছিল....

ঢঙ্। শুভ্রকে অ্যাক্টিং-এ একশোয় একশো দেওয়া উচিত। পারলে অন্তুকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, এদিকে সামনাসামনি গলাগলি বন্ধুত্বের ভাণ! ভণ্ড একটা, আদ্যন্ত মুখোশ পরা মানুষ।

বিরক্তি চেপে আলগা হাসলাম,—তেমন কিছু নয়। স্টমাকটাকে সকালে একটু রেস্ট দিলাম।

—ও। সমুদ্রে যাবি না?

—সবাই চলে গেছে?

—যাচ্ছে। মোটামুটি রেডি। জয়াটা যেতে চাইছিল না, টুটুল এমন বায়না ধরল....

—টুটুলের জ্বর এসেছে না?

—জ্বর নেই। ওই একটু সর্দি, নাক ফোঁচফোঁচ....জয়া মেয়ে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে থাকবে। ....নে নে, ঝটপট তৈরি হয়ে নে।

—এক সেকেন্ড।

দ্রুত শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজে মুড়ে নিলাম নিজেকে। ইচ্ছে নেই, তবু যদি নামি সমুদ্রে! অন্তু ডাকলে কি না বলতে পারব?

সবাই সমুদ্রে চলে গেছে। কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি আমি আর মিত্রা। টুকটাক কথা। মিত্রাই বলছে বেশি, আমি শুধু হুঁ হাঁ করছি। মিত্রার একটা সম্বলপুরী শাড়ি কেনার শখ, এখানে কি তেমন সস্তা হবে? কোথায় একটা হাতির দাঁতের বাক্স দেখেছে, চোখ ফেরানো যায় না, আজ সেটা বগলদাবা করবেই। পল্লব একটু হাঁ হাঁ করবে, তা করুক, মিত্রা আমল দেবে না। পোড়োপিঠেও নেবে মিত্রা, শ্বশুরের জন্য। শ্বশুর নাকি খুব মিষ্টি ভালবাসে। শাশুড়ির জন্য কট্‌কি চাদর কি খারাপ হবে?

কথার মাঝেই সমুদ্রে চোখ পড়ল। কী বড় বড় ঢেউ রে বাবা আজ! পূর্ণিমা অমাবস্যা কিছুই তো নয় এখন, শুধু মেঘ দেখেই এমন ফুঁসছে সমুদ্র? আকাশের রঙ সত্যিই এখন ঘন কালো, ঝড় বৃষ্টি একটা নামতেই পারে।

পল্লবদা মিত্রাকে নিয়ে জলে নেমে গেল। দু হাতে ঢেউকে আদর করতে করতে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। শুভ্র অন্তু কিছুটা দূরে, লড়াই করছে সমুদ্রের সঙ্গে। মধুদা টুটুলকে কোলে নিয়ে পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল।

জয়ার পাশে গিয়ে বসলাম, আজ সমুদ্র কী ভয়ঙ্কর হয়ে আছে দেখেছিস?

জয়া ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল আমাকে। মুখে আকাশের ছায়া। কিছু না বলে ম্লান হাসল একটু, চোখ নামিয়ে নিল।

কাল সকাল থেকেই জয়া বড় চুপচাপ। ফেরার পথে বাসে মেয়েকে আঁকড়ে চোখ বুজে বসে রইল, বিকেলে কোথ্‌থাও বেরোল না, এমনকি মার্কেটিং-এর প্রলোভনেও না। শুধুই মেয়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ? নাকি আঁচ করেছে কিছু? কোনার্কে কিছু দেখে নি নিশ্চয়ই। অন্তু তো বলল জয়া ঘুমোনোর পরই সে এসেছে রুম ছেড়ে। জানলে জানবে। একদিন তো সব মেনে নিতেই হবে, এখন থেকে মনকে প্রস্তুত রাখা ভাল।

পা ছড়িয়ে আধশোওয়া হলাম,—এরকম রাফ চেহারা দেখেও তোর সমুদ্রকে ভাল লাগে জয়া?

—লাগে। জয়া বিচিত্র চোখে তাকাল,—পাহাড়কেও দূর থেকে যত শান্ত দেখায়, কাছে গেলে পাহাড় তত শান্ত নয়। সেখানেও বরফের ঝড় ওঠে, বীভৎস ধস নামে।

জয়া কি ইঙ্গিত করল কিছু? চটজলদি জবাব এল না মুখে।

আবার কী একটা বলার জন্য মুখ ঘোরাল জয়া, তার আগেই পল্লবদা মিত্রা হাঁই হাঁই করতে জল থেকে উঠে এসেছে।

পল্লবদা ধপাস করে বসে পড়ল। দম নিচ্ছে, কাশছে খকখক। থু থু করল বালিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—আইব্বাস্, কী ধাক্কা রে! কোমর একেবারে বেঁকে গেল।

মিত্রার কোমরে হাত। হাসছে,—কিচ্ছু হয় নি। ঠিক ঢেউ ভাঙার সময়ে ডুব না দিলে ওরকমই হয়। চলো চলো, আবার চলো।

—অসম্ভব। আমি আর নামছি না।

—ভীতুর ডিম কোথাকার। ....অ্যাই বন্দনা, তুই যাবি?

—হ্যাহ্, বন্দনা যাবে! সমুদ্রে গর্জন তেল ফেলে দিলেও বন্দনা নামবে না, আই বেট।

—জয়া, তুই?

—না রে, আমাকে বাদ দে।

—তাহলে তুমি আমাকে একটা নুলিয়া ফিট করে দাও।

—নুলিয়া? খবরদার। পল্লবদার মুখে ছদ্ম ত্রাস,—ঠিক আছে, আমিই নয় একটু পরে নামব। খানিকটা রেস্ট নিয়ে নিই।

মিত্রা ঝুপ করে পাশে বসে চিমটি কাটল পল্লবদাকে,—অ্যাই মশাই, নুলিয়াতে তোমার এত আপত্তি কেন? একদম এম সি পি-পনা করবে না।

পল্লব দু হাতে কান ধরল,—আমি এম সি পি নই ম্যাডাম। বড় জোর আমাকে ডব্লিউ ও এল বলতে পারো।

—সেটা কী?

—ওয়াইফ্স্ ওবিডিয়েন্ট ল্যাম্ব। যাকে বলে বউ-এর মেড়া।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম। জয়ার ঠোঁটও ফাঁক হয়েছে সামান্য। মিত্রা কিন্তু গলল না। বলল,—অ্যাই, কথা ঘোরাবে না, কথা ঘোরাবে না।

—আরে বাবা, তোমার ভালর জন্যই তো বলছি। তোমার ওই সোনার বরণ নুলিয়ার ছোঁয়ায় যদি কালো মেরে যায়, আমি সইতে পারব না।

—নেকু। মিত্রাও এবার হেসে কুটিপাটি,—দেখেছিস তোরা, কী জালি লোক? টুপি দিয়ে কেস লাইট করছে।

ভাষা বটে! বিয়ের আগে কি রকে বসত মিত্রা?

অন্তুও জল ছেড়ে উঠে এসেছে। থেবড়ে বসে পড়ল জয়ার পাশে,—কী এত হাসি চলছে তোমাদের?

—তোকে শুনতে হবে না। গ্যাঙ লিডার হয়েছিস, একটু রিফ্রেশমেন্টের আয়োজন কর। ডাব কোথায়, অ্যাঁ?

অন্তু বুঝদারের মতো ঘাড় নাড়ল,—হ্যাঁ ডাব তো চাই। নইলে এই ছোটলোকের মতো সমুদ্রটার সঙ্গে যোঝা যাবে না। ....মধুউ, অ্যাই মধুউ....

মধুদা অনেকটা দূরে। বালি দিয়ে কী একটা বানাচ্ছে, প্রাসাদ টাসাদ বোধ হয়। টুটুল মুগ্ধ চোখে দেখছে সেই বোকামি, অদক্ষ রাজমিস্ত্রির মতো হাতও লাগাচ্ছে মাঝে মাঝে।

হাঁকাহাঁকিতে দুজনেই ছুটে এল। ডাবের নাম শুনেই টুটুলের চোখ বড় বড়, ভেতরের শাঁস খেতে সে বেজায় ভালবাসে, প্রায় আইসক্রিমের মতোই পাকলে পাকলে খায়।

মধুদার ডাকে ডাবঅলা হাজির। ছুলে ছুলে এগিয়ে দিচ্ছে ডাব, স্ট্র সমেত। নোন্‌তা মিষ্টি জল বেশ লাগছে খালি পেটে। সামনেই স্নানার্থীদের ভিড়, তাদের টপকে হঠাৎ চোখ গেল দূরে। একটা মানুষ অনেকটা ভেতরে চলে গেছে, বিশাল বিশাল ঢেউগুলোর ওপারে। সাঁতারু? না তো, লোকটা কেমন ডুবছে আর ভাসছে! একটা হাত জলের ওপর একবার ভেসে উঠল! আর তো দেখা যাচ্ছে না!

বুকটা কেন যেন ধক করে উঠল। পাগলের মতো চোখ ঘোরাচ্ছি, শুভ্রকে তো দেখা যাচ্ছে না কোথাও!

আরেক বার উঠল হাতটা! শুধু হাত!

চিৎকার করে উঠলাম,—অন্তুদা, পুলুদা, শুভ্র কোথায়?

—এই তো ওদিকটায় ছিল।

—না, নেই। ও ডুবে যাচ্ছে। ওই যে, ওখানে, ওখানে....

কে যেন আমায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলল। জ্ঞানহারার মতো ছুটেছি সমুদ্রের দিকে। জল ভুলে, ঢেউ ভুলে, সব ভুলে। লোকজনরাও চমকে গেছে খুব। চেঁচামেচি করে ডাকছে নুলিয়াদের।

মধুদা আমায় এসে টেনে ধরল। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সব কিছু, অন্ধকার....

হাসপাতালে করিডোরে বসে আছি নিথর। বুক ভেঙে কান্না আসছে, অথচ

চোখে আর এক ফোঁটা জলও নেই। এ কী হয়ে গেল? এই রকমই কি আমি চেয়েছিলাম? কক্ষনো না, কক্ষনো না।

ওদিকের বেঞ্চে শুকনো মুখে মধুদা। অনুতোষদা আর পল্লবদা পায়চারি করছে পর্দা টাঙানো কেবিনটার সামনে। সবুজ পর্দা লাল সংকেত হয়ে দুলছে। জল তো সমুদ্রের পাড়েই বার করে দিয়েছে নুলিয়ারা, এখনও জ্ঞান ফিরছে না কেন শুভ্রর?

শুভ্র কি মরে যাবে? আমার জন্য? মাগোঃ।

চিন্তাটা অসাড় করে দিচ্ছে আমাকে, ছেড়ে যাচ্ছে হাত পা। শুকনো টাগরায় জিভ বোলাচ্ছি, জিভও এখন ব্লটিং পেপার, আরও শুকিয়ে যাচ্ছে মুখ। অনুতোষদা এসে কী যেন বলল মধুদাকে, জোরে জোরে দু দিকে মাথা নাড়ছে মধুদা। থম মেরে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অনুতোষদা, এবার পায়ে পায়ে আমার দিকে।

সামনে এসে মৃদু স্বরে বলল,—কতক্ষণ এভাবে ঠায় বসে থাকবে? ....দুপুরে তো খাওয়া দাওয়াও হল না, একটু চা টা দেখব নাকি?

—না।

—একদম খালি পেটে থাকলে তুমিও যে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

—আমি পারব না অনুতোষদা। এখন আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।

—নাথিং টু ওরি। শ্বাসনালিতে জল চলে গেছে, তাই একটু কম্‌প্লিকেশান....ঠিক হয়ে যাবে।

—সান্ত্বনা দিচ্ছেন? আমি জানি, ও আর ফিরবে না।

—আহ্, অশুভ কথা বলতে নেই।

—শুভ্র আমায় শাস্তি দিল অনুতোষদা। ....শুভ্র বড় অভিমান নিয়ে....

—আহ্, থামবে তুমি? কী তখন থেকে বার বার এক কথা বলছ? ওকে না নিয়ে আমি কি কলকাতায় ফিরতে পারব?

অনুতোষদার স্বরে যন্ত্রণা। মাথা নীচু করে চলে গেল। পল্লবদার পাশে বসেছে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। দমকা বাতাস উড়ে এল একটা। ঠাণ্ডা বাতাস, হাড় কেঁপে গেল। চোখ বুজে ফেললাম। ধেয়ে আসছে একের পর এক দৃশ্য। কলেজ গ্রাউন্ডে ক্রিকেট ম্যাচ চলছে, বাউন্ডারি মেরে পঞ্চাশে পৌঁছল শুভ্র। ব্যাট তুলেছে, আমারই দিকে। বিয়ের আসরে মন্ত্র পড়তে পড়তে পা দিয়ে

সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কানের কাছে ফিসফিস করল, আর তোমার বাতাসী বিবি হওয়া হল না। রানীক্ষেতে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে, বন্দনা... বন্দনা... বন্দনা...। আহ্, অত চিল্লাচ্ছ কেন? ....চেঁচাব, চেঁচাব, বাতাসের প্রতিটি তরঙ্গে তোমার নাম আমি মিশিয়ে দেব....

সম্পর্ক যদি গড়েই ওঠে, তবে কেন তা ভেঙে যায়? কোন্ ছিদ্র দিয়ে ঢোকে বিষকীট? কোন্টা সত্যি? তিলতিল করে গড়ে ওঠা, না মুহূর্তে ভেঙে যাওয়া?

এই সময়ে সুখের স্মৃতিই শুধু মনে পড়ে কেন? কষ্টকে কেন আরও বাড়িয়ে দেয়?

—বন্দনা, এই বন্দনা?

—উঁ? চমকে তাকালাম।

—ওঠো। এসো।

—কেন? গলা দিয়ে আর্তনাদ ঠিকরে এল।

—আরে না, নার্ভাস হোয়ো না। পল্লবদা হাসল,—ক্রাইসিস কেটে গেছে। এই মাত্র ডাক্তার এসেছিল। শুভ্রর পালস্ রেট অনেক ইমপ্রুভ করেছে। লাঙস্ টাঙস্ও ক্লিয়ার।

সমস্ত রক্তকণিকা চঞ্চল হয়ে ছুটতে শুরু করল। তড়াং করে লাফিয়ে উঠলাম,—আমি শুভ্রর কাছে যাব। এক্ষুনি।

—যাও।....তবে বেশি কথা বোলো না। খুব উইক আছে। ....আমরা তো দাঁড়িয়েই চলে এলাম।

আর্ত হরিণীর মতো ঢুকেছি কেবিনে। বিছানার পাশে এসে পা থেমে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কী চেহারা হয়েছে শুভ্রর! নির্জীব চোখ, রক্তহীন মুখ, কেমন নেতিয়ে পড়ে আছে অসহায়।

আমাকে দেখেও চোখ উজ্জ্বল হল না। ক্ষীণ স্বর শুধু বলল,—বিশ্বাস করো, আমি বাঁচতে চাই নি।

আর থাকতে পারলাম না। বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো আছড়ে পড়েছি বুকে। একই কথা বিড়বিড় করে চলেছি,—আমায় তুমি মারো মারো মারো, মেরে ফ্যালো।

শুভ্রর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। হাত রেখেছে আমার পিঠে।

এতক্ষণে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

ঢেউ আসে, ঢেউ যায়

ট্রেন যথারীতি লেট। ঢুকেছে প্রায় অফিস টাইমে, হাওড়া স্টেশনে এখন পা রাখা যায়। তারই মধ্যে দিয়ে কুলির পিছন পিছন ছুটছে মধুময়। ট্যাক্সির দীর্ঘ লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মাল নামাচ্ছে গুনে গুনে, এটাই তার কাজ।

বাকিরাও এসে গেল হুড়মুড়িয়ে। কুলিদের ভাড়া মিটিয়েই অনুতোষ সাঁ করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। জয়ার হাত ধরে টুটুল। মিত্রা ড্রেনের কাছে গিয়ে একটা একটা করে ওয়াটার বটল খালি করছে। টুক করে একটা খবরের কাগজ কিনে হেড লাইনে পাখির চোখ বোলাতে শুরু করল পল্লব। শুভ্র এখনও দুর্বল, রেলিঙের ধারের ধাপিতে বসে পড়ল। পাশ থেকে বন্দনা গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখছে, লাইন কেন এগোচ্ছে না।

মধুময় গজগজ করে উঠল,—কোনও মানে হয়? ভেবেছিলাম সকালে ফিরে ডিউটিতে যাব....

—অ্যাই, ডিউটি দেখাস্ না তো। পল্লব আলগা খিঁচিয়ে উঠল,—আমার শালা একদিন নো পে হয়ে গেল....

—মাইনে কেটে নেবে? তুই অফিসারের চাকরি করিস্ না?

—হ্যাঁ রে গাড়োল। উইদাউট নোটিসে কামাই করলে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যানেরও মাইনে কাটা যায়।

শুভ্র বলে উঠল,—তুই এখান থেকে সোজা অফিস চলে যা না। তোর লাগেজ আমরা বাড়িতে ঢুকিয়ে দেব। তোর মিত্রাকেও।

জয়া মুখ টিপে হাসল,—অ্যাই মিত্রা, দ্যাখ, শুভ্রদা আবার আমাদের লাগেজ বলছে।

অনুতোষের ডাক শোনা গেল,—অ্যাই জয়া, অ্যাই টুটুল, পুলু শুভ্র এদিকে আয়। তাড়াতাড়ি....

—কোথায় যাব লাইন ছেড়ে?

—আরে আয় না, একটা প্রাইভেট কার ম্যানেজ করেছি। হানড্রেড। আয় জলদি, তাগাদা লাগাচ্ছে।

হাতের সামনের বোঁচকা বুঁচকি তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সবাই। মিত্রা কয়েক পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়াল,—ওকি মধুদা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? স্যুটকেস দুটো তুলে নিন। উফ্, ঝোলা ব্যাগগুলো পড়ে রইল যে, ওগুলো আগে ওঠান।

মধুময় দু গাল ছড়িয়ে হাসল। সব থেকে ভারী জিনিসগুলো তার জন্যই পড়ে

থাকে, সে জানে।

ডিকিতে মাল তোলা হচ্ছে। পল্লব একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে, জোরে জোরে কটা টান দিয়ে বড়সড় হাই তুলল,—যাক গে, আজ নয় অফিসটা গেল। শুভ্র, তুই এই উইকটা ডুব মেরে দে। একদম ফিট হয়ে জয়েন করবি।

—আমি ফিট। শুভ্র হাসল।

—মোটেই না। তুমি আজই একবার ডাক্তারের কাছে যাবে। বন্দনা মাথা নাড়িয়ে তড়িঘড়ি বলে উঠল,—এখন তোমার টোটাল বিশ্রাম।

শুভ্র দু হাত ছড়িয়ে সামনে ঝুঁকল,—যো হুকুম।....অন্তটারই ইল্ লাক, ফিরেই ব্যাটাকে কলেজ দৌড়তে হবে। তোর আজ দেরিতে ক্লাস না অন্ত?

—হ্যাঁ, দুটো পনেরোয়। অনুতোষ ভারিক্কি মুখে ঘড়ি দেখল।

জয়া খুকখুক হাসল,—কায়দা করছ কেন? তুমি যাবে আজ কলেজ? এক্ষুনি তো গিয়ে ভোঁস ভোঁস নাক ডাকাবে।

মেয়েরা পিছনের সিটে বসে পড়ছে। পল্লবও ঠেসে ঠুসে মিত্রার পাশে জায়গা করে নিল। অনুতোষ আর শুভ্র সামনে, অনুতোষের কোলে টুটুল। আর ঠাঁই নেই।

মধুময় জানলা দিয়ে মুখ গলালো,—আমার কী হবে?

পল্লব হ্যা হ্যা হাসল,—তোর লাগেজটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তুই বাসে চলে আয়।

গরগর আওয়াজ তুলল অ্যাম্বাসাডার, যান্ত্রিক সরীসৃপের সারিতে মিশে গেল।

একটুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল মধুময়। লক্ষ মানুষের ভিড়েও সম্পূর্ণ একা হয়ে, যেমন সে থাকে সব সময়। তারপর আপন মনে হাসল একটু, যেমনটি সে হাসে।

সে এখন মোটেই বাসে উঠবে না। লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে চলে যাবে বাবুঘাট, তারপর হাঁটবে....হাঁটবে....হাঁটবে। সবুজ মাড়িয়ে।

তার মধ্যেই শুধু এক ফালি সমুদ্র রয়ে গেছে এখনও।